Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata / Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 1, No.1, *Sravana*, 1363 B.S (1956) – Year 4, No. 3 - 12, 1367 B.S. (1960).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: O.K. / Good. Cover page of *Sundaram* 2nd yr, no. 3 is partially torn.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

সুন্দরম্

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

লেখক :	লেখা :
দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল	পাঠকের দায়িত্ব
শুভেন্দু ঘোষ	ভাস্কর, চিত্রকর এবং কবি
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	দুটি সার্থক চলচ্চিত্র
দ্বিজেন্দ্র মৈত্র	শিল্পী হেমন্ত মিশ্র
সুধীর চক্রবর্তী	সংগীত-জিজ্ঞাসা
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	নাম মাশুরা
সাধন চট্টোপাধ্যায়	শিল্পশাস্ত্র ও সাহিত্য

সম্পাদক : সুভো ঠাকুর

মূল্য : একটাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

গোষ্ঠ-লীলা। বাংলার প্রাচীন পটচিত্র। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত

উৎকৃষ্ট বিস্কুট বাজার দরে

বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যপ্রদ
সুস্বাদু ও পুষ্টিকর
স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ - কলিকাতা-৪

L-3/59

উপহার

যে কোন উপলক্ষ্যে
সকলেই যা কিনে
দিতে পারেন

ডানলপিলো

তোশক বালিশ গদি তাকিয়া ট্র্যাভ্‌লিং কিট

DPC.99 BEN

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ কর্পোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা - ১২

Cool
and
Exhilarating

BCPW

Eau-de Cologne

The pleasing perfume to keep you fresh in all seasons.

BENGAL CHEMICAL

CALCUTTA · BOMBAY · KANPUR

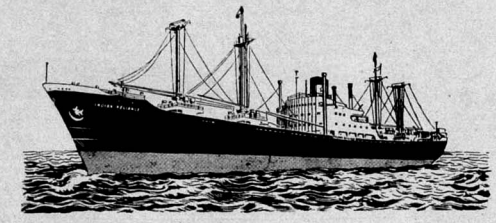

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিঃ

ভারত-যুক্তরাজ্য-কণ্টিনেণ্ট সার্ভিস

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল বন্দরেও যাতায়াত করে

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন ঃ ২৩-১১৭১ (৮টি লাইন)

সম্পাদকীয়
সুভো ঠাকুর
পাঠকের দায়িত্ব
দীপ্তেন্দুকুমার সান্যাল
ভাস্কর, চিত্রকর ও কবি
শুভেন্দু ঘোষ
দুটি সার্থক চলচ্চিত্র
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
শিল্পী হেমন্ত মিশ্র
দ্বিজেন্দ্র মৈত্র
সংগীত-জিজ্ঞাসা
সুধীর চক্রবর্তী
নাম মাশুরা
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
শিল্পশাস্ত্র ও সাহিত্য
সাধন চট্টোপাধ্যায়
খবরাখবর
প্রভাত বসু
সোমেন্দ্র মিত্র

সূচীপত্র সুন্দরম্। চতুর্থ বর্ষ। তেরোশো ছেষট্টি। দ্বিতীয় সংখ্যা

অপ্সাসজ্জা | **রণেন আয়ন দত্ত**

সম্পাদকীয় সুন্দরম্

এ-যুগ সুনিশ্চিত গতির যুগ—অর্থাৎ বর্তমানকে অতীতে ঠেলে কতো দ্রুত গতিতে ভবিষ্যতে পা বাড়ানো যায়—এ-যুগ বুঝি তারই যুগ! প্রতি মুহূর্তে মূল্যমান অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলে ভ্যালুজ্—তার নিরবধি বস্ত্রহরণ-পর্ব-রূপ লাঞ্ছনার যেন অবধি নেই এ-যুগে।

আজ কদিন আগেও যে ভারতবর্ষে 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'-রবে ঊর্ধ্ববাহু নৃত্য করা হোয়েছে—সেই ভারতবর্ষেই পুনশ্চ সেই চীনকেই কিনা অকস্মাৎ 'ভাই না ছাই' বোলে এক কথায় নাকচ করা—শুধু সুভো ঠাকুর নয়, সুভো ঠাকুরের মতোই ভদ্রলোক জহরলালও ভ্যাবাচ্যাকা মেরে যায়।

আজ যাকে ভ্রাতৃপ্রতিম বোলে ভারত-প্রতীক জহরলাল বাহুবন্ধনে আলিঙ্গনপূর্বক ভ্রাতার আসনে আসীন করিয়ে সিংহ-সম্মানদানে দরাজ, কাল তাকেই কিনা বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকায় অবতীর্ণ দেশদ্রোহী হিসেবে বন্দীশালায় প্রেরণ করার তাগিদ!

এ ব্যাপারে জহরলাল তো দূরের কথা—মানুষ, তথা মুখলজ্জার অধিকারী ভদ্র মানুষ হিসেবে ঐরূপ ঘটনার সামনে নিতান্তই অসহায় মনে করা—এমন কি সুভো ঠাকুরের পক্ষেও নেহাতই স্বাভাবিক নয় কি?

তাই তো সবাই বলে—রাজনীতি সংলোক ও লজ্জা-ধর্মের অধিকারী ভদ্রলোকদের জন্য নয়। রাজনীতিতে ভদ্রলোকের ও সংলোকের স্থান সদাই সংকুচিত। বর্তমানের নিঃস্বার্থ সদাচার, ভবিষ্যতের কুটিল অকৃতজ্ঞতায় আর রাজনৈতিক রাহাজানিতে রক্তাক্ত ও আহত হওয়ার আশু সম্ভাবনায় সদাই আশঙ্কিত।

এই রাজনীতির রাজবিষ তথা অকৃতজ্ঞতার ও কৃতঘ্নতার কালকূট—শুধু রাষ্ট্রপরিচালনায় নয়, শিল্প সাহিত্য কলা বিজ্ঞান প্রভৃতি দেশের তাবৎ দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরার সর্বত্রই প্রবেশপূর্বক দৃঢ় সংকল্পসহ সমূহ সর্বনাশ সাধনের জন্য যেন নব নব উদ্ভাবনায় উদ্দীপনায় অহরহ উৎসাহিত।

এ-ব্যাপারে তাই তো ভদ্রমানুষ সুভো ঠাকুর আজ ভদ্রলোক জহরলালের মতই নিছক ভ্যাবাচ্যাকা মেরে যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর অবলোকনে নিতান্তই অপারগ।

অবশ্য এখানে উপরিউক্ত এতো কথার উল্লেখ বা অবতারণা আদতে কলা ও কৃষ্টির ব্যাপারেই কিন্তু!...

এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত নয় কি—যে, ভারতীয় চিত্রকলার কোষ্ঠীবিচারে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের প্রধান হোতা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথই স্বকীয় কৃতকর্মের বিস্তারিত কীর্তিতে আচার্যের আসনের ন্যায়সংগত দখলকার।

অহল্যা হেন পাষাণে পরিণত তদানীন্তন ভারত-শিল্পকে তাঁর অননুকরণীয় তুলির স্পর্শে পুনঃ প্রাণ-সঞ্চারিত কোরে তোলায় একমাত্র তিনি আর্যপুত্র দশরথ-আত্মজের সঙ্গেই তুলনীয়। তাঁর শিষ্যবৃন্দ, অর্থাৎ সেই নবজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত সেদিনের অবনীন্দ্রশিষ্যেরা কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, ভারতের সীমানা অতিক্রমান্তে দিকে দিকে সেই নব-শিল্পের সাধনা-সিদ্ধ শুদ্ধ হোমানল প্রজ্বালিত করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় পারঙ্গম, কৃতকার্যতায় সুনিশ্চিত মুখোজ্জ্বলকারী। সেদিন তাঁরা তাঁদের গুরুর সাধনা-লব্ধ সিদ্ধির শুধু প্রচার কোরেই ক্ষান্ত হন নি, প্রসারিত কোরেছিলেন বাংলার তথা ভারতের মর্যাদার মানচিত্রও।

এ-কথা কে অস্বীকার করার স্পর্ধা রাখে যে কুমায়ুন থেকে কুমারিকা অর্থাৎ উত্তর ভারত হোতে দক্ষিণ ভারত অবধি একদা অবনীন্দ্রনাথ শিষ্য ও তস্য-শিষ্য-সহ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত কোরেছিলেন তাঁর তুলির বাঙ্ময় রেখায় বাংলার জয়ধ্বনি। দিল্লিতে সারদাচরণ ও বরদাচরণ উকিল, পাঞ্জাবে সমর গুপ্ত ও আব্দার রহমান চুঘ্‌তাই, লখনৌ-এ অসিতকুমার হালদার, হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ও বীরেশ্বর সেন, অন্ধ্রে প্রমোদ-কুমার চট্টোপাধ্যায়, মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সিংহলে মণীন্দ্র গুপ্ত, শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু, কোলকাতায় মুকুল দে প্রমুখ তদানীন্তন অবনীন্দ্র-শিষ্য ও তস্যশিষ্যরা ভারতবর্ষের শিল্পে নবজাগরণের ঝাণ্ডা প্রোথিত করার সমর্থতায় সাধারণের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আজ কেন তাঁদের প্রতি 'ভাই-ভাই' এর বদলে এ হেন 'দূর-দূর

ছাই-ছাই'! এর আদত কারণ অন্বেষণের অবশ্যই আবশ্যক আছে না কি?

স্বাধীনতা পাবার পূর্বে যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাগ্রে সর্বদাই এগিয়ে থাকত—তা সে রাজনীতি শিল্প সংগীত নাটক নৃত্য সাহিত্য সংস্কৃতি যে ব্যাপারেই হোক না কেন—যার নিঃস্ব হোয়ে উজাড়-করা দান সমগ্র ভারতের সর্বত্রই অলক্ষিতে এবম্বিধ ছড়ানো, সেই বাংলাদেশের শিল্পীদের প্রতি অহেতুক আক্রমণাত্মক অস্বীকৃতিকে কৃতঘ্নতারই নামান্তর মনে হওয়া অতি স্বাভাবিক নয় কি? বাংলা প্রদেশ-প্রদত্ত কৃষ্টিজগতের এহেন দানের প্রতি অকৃতজ্ঞতার আভাসে ভারতের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উদার আকাশের অন্তরালে রাজনীতির বিষাক্ত রাহাজানির অমঙ্গলময় রক্তপুচ্ছ-ধূমকেতুর হেতু-কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় মাত্র।

ইদানীং বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চিত্রকলা ভাস্কর্য ইত্যাদি আজ ধনী ব্যক্তিবিশেষের সংগ্রহশালার আদরের ব্যূহ অতিক্রম করে জাতীয় ধর্মশালার গণতান্ত্রিক সমাদরের প্রাঙ্গণে স্বতঃস্ফূর্ত পদার্পণরত।

কিন্তু এ-ব্যাপারে দেশের শিল্পী ও শিল্পকলার মর্যাদার ঊর্ধ্বগতি বা অধোগতি কী ঘটছে তা চিন্তা করার সময় একান্তই আগতপ্রায়—বিশেষ কোরে বাংলাদেশের পক্ষে তো বটেই।

সর্বজনমতে এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত—যে, জাতীয় সরকার—সে যে-জাতীয় সরকারই হোক না কেন,—একটি বিরাট যন্ত্রেরই নামান্তর মাত্র। আর শিল্পীদের পক্ষে মুশকিল ঠিক ঐখানটাতেই। কারণ শিল্পীরা যন্ত্র নয়—মানুষ। উপরন্তু নেহাৎ-ই স্পর্শকাতর। এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলেই বোধগম্য হবে যে যান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষক কখনোই মানবধর্ম অনুযায়ী অযান্ত্রিক স্পর্শকাতর মানবগ্রহীতার ঠিক ভালোমন্দ বিচারে তাদের সুখ-দুঃখে পাশে এসে দাঁড়িয়ে সঠিক সময়ে দুঃখ-দুর্দিন ঘোচাবার ব্যবস্থায় নিতান্তই অক্ষম।

জাতীয় সরকারবাহাদুর অধুনা দেশের সুসন্তান ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের নাম জড়িত কোরে, কখোনো আবার বিভাগীয় আকাদমির স্বনামে—একটি বিচার সংস্থার পরামর্শমত অথবা ঐ সকল বিভাগীয় আকাদমির বিবেচনাধীনেই—শিল্প-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রলুব্ধ করার মত আর্থিক পুরস্কার বিতরণে পুলকিত!

জাতীয় সরকারের পক্ষে এ চেষ্টা সুনিশ্চিত শুভকর্মই বটে। তাঁদের এরূপ সাধু সংকল্প কার্যকরী করার প্রতি সন্দেহের কটাক্ষ ক্ষেপণের কোনো কারণ ঘটার মত ঘটনা আজো অবধি ঘটেছে বোলে তো মনে পড়ে না।

কিন্তু সরকার বাহাদুরের এইরূপ সুনিশ্চিত শুভকর্ম অচিরাৎ বানচাল হোতে বাধা, যখন দেখা যায়—আইন বজায় রাখতে স্বনামধন্য কথা-শিল্পী ও শিল্পীদের সেই সব অপাঠ্য পুস্তকে ও শিল্প-সৃষ্টিতে পুরস্কার বিতরিত—যা দালালি বা দলাদলির ভারসাম্য বজায় রাখা ব্যতীত কোনো উদ্দেশ্য সাধনেই অপারগ। ঐ সকল পুস্তক বা সৃষ্টিকার্য সাধারণের যুক্তিতর্ক ও বিচারবোধের নাসিকাগ্রে নেহাতই মুষ্ট্যাঘাত করত কোনো বিচারেই পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জনে একান্তই অযোগ্য।

এব্যাপারে আপসোস হোলো এই—যে, পুরস্কারপ্রাপ্ত সেই সব শিল্পী-সাহিত্যিকদের পূর্বে প্রকাশিত পুস্তকের বা শিল্প-সৃষ্টির মোটেও অভাব নেই—যেগুলির মধ্যে—পুরস্কারসম্ভারূপ স্বয়ম্বরসভার বরমালা লাভের অঢেল সম্ভাবনা সর্বত্র ঢালাও ভাবে বিদ্যমান।

স্বনামধন্য কথা-শিল্পীদের নিকৃষ্ট সৃষ্টির প্রতি জাতীয় সরকারের এ-হেন নেক-নজরের কারণ অনুসন্ধানে জানতে পারা যায়—যে, আইন বজায় রাখতে ঐ সকল পুরস্কার মাত্র যে বৎসরে পুরস্কার বিতরিত হয় সেই বৎসর নিয়ে তিন বৎসরের মধ্যে রচিত হিসাবেই নাকি দেয়। অবশ্য সাধারণের কাছে এই অদ্ভুত যুক্তি কিছুটা কাজির বিচারের মতই শোনায় নাকি?

শ্রীকৃষ্ণ—'দস্তর' নামক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেও যদি আজও তাঁর জবরদস্ত লীলা দেখাতে সক্ষম—তবে কৃষ্টিমন্ত্রীকেও শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে আইনকে-অন্তরম্ভা-প্রদর্শনকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই বিশেষ বাঁশির সুরটির শিক্ষানবিশি করার ইপ্সিত দিলে অশিষ্টতা হবে কি? তাতে বিশেষ কোরে, আর্টিস্টদের উদ্দেশ্যে তৈরি লাল-ফিতের তাঁবেদারিতে এইরূপ অদ্ভুত আইন কিছুটা শিথিল হোতে পারে হয়তো।

পাঠকের দায়িত্ব

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

'নীলকণ্ঠ'—এই ছদ্মনামের আড়ালে—অধুনা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যিনি সাড়া তুলেছেন তিনি বয়েসে এখনো তরুণ। অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। শ্লেষ ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায়, পরিহাসের মাধুর্যে, পাঠক-চিত্তকে আচ্ছন্ন করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে।

বহুবিকৃত বাঙলা বইগুলিকেই যখন একালে বহুবিক্রীত বাঙলা বই বোলে বিজ্ঞাপিত হোতে দেখি, তখন জানতে ইচ্ছে করে—আসলে আপনি কে? আপনি ঠক্ না আপনি পাঠক?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের Sexpeerরা যখন একের পর এক তন্ত্র-মন্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ প্রক্রিয়ায় বাস্তব সত্যের নামে জীবন-অসত্য বীভৎস রস পরিবেশনে ব্যস্ত তখন আপনিই তো সেই বই পোড়ে, আরো পাঁচজনকে পোড়িয়ে, রজত জয়ন্তী সংস্করণ অত্যাসন্ন কোরিয়ে পুনশ্চ পত্রাঘাত করেন। পত্রাঘাতও যখন করেন এই বোলে যে, 'অমুক জঘন্য রচনার এমন জয়জয়কার কেন?', তখন 'আপনি ঠক না আপনি পাঠক'—এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক নয় কি?

আজ যখন সিনেমার কাগজ চাঁদির জুতো দিয়ে সাহিত্যের জাত মারছে, সাহিত্যিকরা একের পর এক রথ দেখার নামে এবং আর্টের বেনামে কলা বেচছে, তখন সাহিত্যের পাঠকে এবং সিনেমার দর্শকে তফাত থাকছে কই? অস্বাভাবিক কালধর্মে এ যুগের ছেলে-মেয়েরা যখন দেহের এবং মনের ক্ষুৎপিপাসায় কাণ্ডজ্ঞানহারা, তখন শহরের দেয়ালে দেয়ালে অশালীন বিজ্ঞাপনের মুখে উত্তেজক চিত্রের দন্ডোক্তি: ভিনি-ভিডি-ভিসি। মোদকের দিন গেছে, তার বদলে এসেছে চরমোত্তেজক ছায়াচিত্রের নূতন আমোদক। এই সব চিত্রের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক তারাই, যারা বারবার এই ছবি দেখবার পরও আবার দেখে, এবং আর একবার দেখবার জন্যে মাইনে পাবার দিন গোনে। প্রায় ক্ষেত্রেই এরাই আবার 'সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু'-তে জানতে চায়—'এমন বিকৃতরুচির ছবি সেন্সারে পাশ হয় কি কোরে?' এই হিন্দি ছবির দর্শকে আর বাঙলা সাহিত্যের পাঠকে আজ একটুও তফাত নেই। সত্যজিতের ছবিই 'একমাত্র সত্য' যাদের মুখে শুনবেন—দেখবেন, ছবি দেখার বেলায়—উত্তম-সুচিত্রার ছবি দেখতে তারাই আবার অজ্ঞান। যদি একই সঙ্গে চালু সত্যজিত রায়ের ছবি আর আমরা যে ছবির কথা বোলছি সেই ছবির টিকিটঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ান কখনো তবে তৎক্ষণাৎ কিউ-এর দৈর্ঘ্য মালুম হবে মর্মকথা। এ 'কিউ' কোয়েশ্চেনের আদ্যক্ষর যে কিউ সে-

কিউ নয়। এ-কিউই আসল কিউ। বস্ অফিস সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে বড় কিউ। বাঙলা সাহিত্যের পাঠকের মুখে 'রবি', মনে—'শশধর'। মুখে ক্লাসিক্স মনে কমিক্স্। মুখে কৃষ্টি, মনে আগাথা কৃষ্টি। সাহিত্যের পাঠক আর সিনেমার দর্শক—নামে আলাদা, কিন্তু জাতে এক। গাঁদা ফুলকে মেরি গোল্ড বোললে, বিউটিফুল শোনাতে পারে কিন্তু মূল্য বাড়ে কি?

তাই জানতে ইচ্ছে করে, ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে; আপনি ঠক্ না আপনি পাঠক? তার কারণ আপনি ভেবে দেখেছেন কি আপনি কাকে ঠকাচ্ছেন? আপনাকে ছাড়া আর কাকে? যদি প্রত্যয় না হয় সেই কারণেই এ-রচনার প্রস্তাব। এই রচনায় আপনি আপনার নিজের মুখ দেখতে পাবেন। আপনাকে দেখানোর প্রয়োজন আছে। কারণ পরকে যে ঠকায় পরলোকে তার কি মেলে জানি না, ইহলোকে তার প্রায় সব মেলে। এমন কি মরবার অব্যবহিত পর তার শবের সঙ্গে জয়ধ্বনিমুখরিত অগণিত অনুগামীর সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু যে নিজেকে ঠকায় তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বাইবেলেও নেই, বেদেও না। তাই আপনার নিজেকে দেখবার জন্যে প্রয়োজন দর্পণের। এই প্রবন্ধ আপনার আসল চেহারার প্রতিবিম্ব মাত্র। দাঁড়ান। নিজেকে দেখবার আগে এই দর্পণে দেখে নিন, আপনি যার অনুরক্ত পাঠক বোলে গর্বিত সেই বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের অবিকৃত প্রতিকৃতি। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের আসল অবস্থা, তার চরম দুরবস্থার দুঃসহ চিত্র এই দর্পণে কেমন বিচিত্র রূপ ধোরে অপরূপ হোয়ে দেখা দিয়েছে। তারপর হয়তো আর নিজের মুখ আর দেখবার দরকার হবেনা। মুখোস খুলে যাবে নিজে থেকেই। এবং তখন দুহাতে আপনি নিজের মুখ নিজেই ঢাকবেন, এমন আশা করা একটু বেশী হোলেও একেবারে অসম্ভব একথা অন্ততঃ আমি আজও মানতে নারাজ। তার কারণ আপনি হিন্দির নয়, বাঙলা সাহিত্যের পাঠক। আচরণে না হয়, বংশপরিচয়ে যে আপনি আজও জাতিশ্রেষ্ঠ—এ কথা কি আপনি অস্বীকার কোরতে পারেন?

দুই

শেক্সপীয়র ছিলেন সাহেব। তিনি বিগত হবার পর তাঁর একাধিক মোসাহেব বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের কেউ সম্রাট, কেউ উজীর, কেউ তহশীলদার, কেউ আমীর, কেউ ওমরাহ। শেক্সপীয়রের ভূত যারা—এখন দেশে দেশে আবির্ভূত, এরা কেউ শেক্সপীয়রের চেয়ে কম যাননা। এঁরাও সবাই একেকটি Sexpeer! এঁরা সময়ে এসেছেন, ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃসময়ে দেখা দিয়েছেন। মানুষ নয়, সবার উপরে যখন ফানুস অর্থাৎ রকেট সত্য, সেই যুগে এসেছেন এঁরা। যখন মানুষের সেই ধৈর্য নেই, সেই স্বাভাবিক পরিবেশ নেই, আবহাওয়া যখন অত্যন্ত উত্তপ্ত, সুস্থ, সৎ চিন্তাশীলতার দিন যখন প্রাগৈতিহাসিক হোয়ে এলো—মানব-ইতিহাসের সেই চরম দুর্দিনে দেশে-দেশে দেখা দিয়েছেন তখন ভগবানের নয়, শয়তানের দূত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যখন কলুষপূর্ণ এবং রক্তাক্ত আরেকটি কুরুক্ষেত্রের জন্যে পাশাখেলা চোলছে তখনি শোনা যাচ্ছে শকুনির অট্টহাসি।

তার ঢেউ বাঙলাদেশের তটে এসেও ধাক্কা দিয়েছে। স্বাধীনতা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাঙলা দেশ ভাগ হোয়ে গিয়েছে দুভাগে। সেই সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যও আজ দুভাগে ভাগ হোয়ে যেতে বোসেছে। জাতসাহিত্য ও বজ্জাত সাহিত্যের লড়াইয়ে জাতসাহিত্যের জাত গেছে, আর সেই সঙ্গে পেট ভোরে উঠেছে বজ্জাত সাহিত্যের। নানান ছদ্মবেশে দেখা দিয়েছে আজ বজ্জাত সাহিত্য এদেশে। কেউ তন্ত্রের বেনামে সাহিত্যের Sexpeer! কেউ পঞ্চতন্ত্রের নামে রম্যরচনাকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভূত ভর কোরেছে কারুর ঘাড়ে, আবার কারুর অদ্ভুত কল্পনাশক্তি জীবনীর দুধের বদলে উপন্যাসের পিটুলিগোলায় জীবনীসাহিত্যকে গোল্লায় দিতে সমুদ্যত। কেউ সিনেমার দিকে তৃতীয় চোখ রেখে, দুচোখ বন্ধ কোরে, বিশপাতার গল্পকে উপন্যাস বোলে চালানোর কৃতিত্বে বাঙলাভাষায় সর্বাধিক বিকৃত চারশো বিশ কাগজের পাতায় অহর্নিশ পরিবেশন কোরে চোলেছে—একটুও স্বিধা না কোরে, চারশোর চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী মারাত্মক—প্রকৃতির বিষ। এরা সাহিত্যের ইম্পর্টাণ্ট পার্সন মাত্র নয়। কেউ কেউ ভেরি ইম্পর্টাণ্ট পার্সনও বটে।

কথামালায় পড়া গেছে ব্যাং-এর যখন দুঃসময়, তখন ঢিল ছোঁড়ায় উন্মত্ত বালকদের ছিলো সুসময়! বাঙলাদেশেরও আজ যখন দুঃসময় তখনই দেখছি বাঙলা-সাহিত্যের অ্যাং-ব্যাং লেখকদের চরম সুসময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই বাঙলাদেশের কৈশোর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রথম দেখলো পথের উপর সেইসব কান্ড দিনের আলোয় ঘোটতে, যা বর্ণনারও অতীত লজ্জার। যুদ্ধ এক সময় থামলো, বিদায় নিলো খাকীরা। কিন্তু দাগ বোসে গেলো কিশোরমনে। চিরকালের মতো ভেঙেচুরে গেলো যা কিছু শ্রদ্ধার—তার ভিত। এবং তার সুযোগ নিলো বোম্বাই সিনেমা। সিনেমার চটুল সুর—সুড়সুড়ি দেওয়ামাত্র, হুড়মুড় কোরে ভেঙে পড়লো প্রেক্ষাগৃহের সামনে তারাই, যাদের এই দুষ্কর্মের পীঠস্থান থেকে থাকা উচিত ছিলো শতহস্ত দূরে।

সিনেমা থেকে সাহিত্যের আঙিনায় এখন পা বাড়াচ্ছে এই পাপ। সাহিত্য আজ আর নেশা নয়, পেশা। পেশাদার লেখক চাইছে সস্তায় কিস্তিমাত কোরতে। চাইবারও কথা। পাঠককে পেষাই যে লেখকের একমাত্র পেশা হোয়ে দাঁড়িয়েছে আজ, তার প্রধান কারণ সস্তায় কিস্তিমাতের পেছনে প্রচণ্ড উস্কানি রোয়েছে প্রকাশকের। প্রকাশক বোলছে, যে বইএর সংস্করণ সাতদিনে হয় সে বই-ই শুধু বই। তার লেখকই শুধু লেখক। এইভাবে জাল লেখক এবং ভেজাল প্রকাশকে ছেয়ে গেছে কিতাবপট্টি। জাত লেখকদের দিন গেছে, এসেছে বজ্জাত লেখকদের সুদিন। একদিন পকেটকাটা ছিলো যার পেশা, তারও আজ 'যখন পকেটমার ছিলাম' বোলে বই লিখতে বাধা নেই। সে বই এদেশের সাপ্তাহিকে, মাসিকে ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ কোরতে নেই অসুবিধে এবং ঝকমকে মলাটে বিক্রি হোতেও অনন্ত সুবিধা আজ সকল সম্ভ্রান্ত দোকান থেকেই।

জাল লেখক এবং ভেজাল প্রকাশকের সোনায়-সোহাগা যোগাযোগ ঘোটেছে লাইব্রেরীর কৃপায়। পাড়ায়-বেপাড়ায়, অফিস-পাড়ায়, স্কুল-পাড়ায়, কলেজ-পাড়ায় গোড়ে ওঠা লাইব্রেরী—গোরী সেনের টাকায় আজ ছিনিমিনি খেলতে বোসেছে। এতো টাকা তাদের হাতে এসেছে যে, যেকোনো বই বেরুনো মাত্রই তারা এক অথবা একাধিক কপি বিনাবিচারে নিয়ে এসে ঘর সাজাচ্ছে। প্রকাশক তাই দেখছে যে, যে কোনো বই কেবলমাত্র লাইব্রেরীর কৃপায় প্রথম সংস্করণের গিরি লঙ্ঘন কোরছে অতি দ্রুত। ফলে যারা কোনোদিনো পুস্তক প্রকাশনা কি বস্তু জানতো না তারা আজ ঘর ভাড়া নিচ্ছে কিতাব-পট্টিতে। যারা কোনোদিন নিজের কলমে একখানা পোস্টকার্ডও পুরো লেখেনি তারাও নাম লেখাচ্ছে 'রাইটার্স ক্লাবে'।

লাইব্রেরীর পরেই বিয়েবাড়ি। নতুন বই, নতুন বউ-এর হাতে তুলে দেওয়ায় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, উন্নত-রুচি এবং অর্থ একসঙ্গে রক্ষা করা সম্ভব দেখে, লোকে বউভাতকে বইভাত জ্ঞান কোরে কৃতার্থ। বিয়ের বাজার কোরতে আজ তাই বইয়ের বাজারেও একবার যেতে হয়। আর যেতে হয় বোলেই প্রকাশক বিয়ের তারিখ বুঝে বই ছাড়ছে, নতুন বইকে নতুন বউএর মতই সাজিয়ে বার কোরছে এবং লেখককে বইএর বিষয় যাই হোক বইএর নাম প্রিয়াদের পসন্দসই দিতে বাধ্য করাচ্ছে। চকচকে মলাট, ঝকঝকে ছাপা, বিয়ের মাসে, বইএর বাজারে আর মাছের অথবা মিষ্টির বাজারে তফাত নেই আর। লগ্নশা সর্বত্র। এই বউভাত উপলক্ষ্যে একই বইএর ভাগ্যে কখনও কখনও বারবার ছিঁড়ছে বই-ভাতের শিকে। এমন কি কোনো কোনো বিয়েবাড়িতে ঢোকবার মুখেই নোটিশ : অমুক বই এতোগুলি পাওয়া গেছে; দয়া কোরে আর ঢেউ বই দেবেন না। নতুন বউএর বাক্সর মধ্যে নতুন বই প্যাক হোয়ে চোলে যায় শ্বশুরবাড়ি। সেখানে বহুদিন বাক্সবন্দী থাকে, কখনও কখনও পাড়াপড়শীর হাতে উধাও হয়। প্রায়ই পড়া হয় না। পড়া হোলেও, একই বই এতো বেশী বউভাতে পড়ে যে, ভালো বই পাতে পড়ার অযোগ্য বিবেচিত হয় প্রকাশকের দৃষ্টিভঙ্গীতে। অন্যদিকে লাইব্রেরীতেও কখনও কখনও টাকা পর্যাপ্ত এবং বাঙলা বই অপর্যাপ্ত হওয়ায় একই বই তিনচারখানা কোরে কিনে উদ্বৃত্ত অর্থ অপচয় হয়। ফলে, বাঙলা বইয়ের বিক্রি বাড়ে কিন্তু পাঠক বাড়েনা সেই হারে। বিশ্বের বইয়ের জগতে এমন বিস্ময়কর দুর্ঘটনা বাঙলা বই-ই ঘটাবার কারণ হোলো।

কিন্তু এতে আমার আপত্তি খুব সোচ্চার নয়। নয় তার কারণ বাঙলা বইয়ের বিক্রি বাড়াই বাঙালী লেখকদের এখন সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন। 'কল্লোল' পত্রিকার অকালে লেখকমাত্রই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে নির্ভর কোরতে বাধ্য হোতেন লেখা ছাড়া অন্য যা কিছুর ওপরই। এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রমাণ হোয়ে

গেছে যে, নেশার দিন চলে গেছে, তার বদলে এসেছে পেশার দিন। যে খেলায় বড় হোতে চায় তাকে খেলতে হবে সারাদিন; যে লেখায় বড় হোতে চায় তাকে লেখা নিয়েই থাকতে হবে কেবল। তাই লেখা যদি বাঙালী লেখকদের গ্রাসাচ্ছাদন জোগাতে পারে, তা সে লাইব্রেরীই হোক আর বিয়েবাড়ির কল্যাণেই হোক তাকে সানন্দে স্বাগত জানাতে আমার অকুণ্ঠ উৎসাহ।

নিরুৎসাহ বোধ কোরছি আমি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। নিরতিশয় অবসাদ আচ্ছন্ন কোরেছে আমার মন সম্প্রতি। নিরুদ্বেগ না থাকবার কারণ ঘোটে গেছে অন্যত্র। তাঁর এসেছে অন্যদিক থেকে। লেখার জন্যে টাকা পাবে লেখক, যথেষ্ট টাকা পাবে এতে কার আপত্তি টিঁকবে? বরং তাই-তো হওয়া উচিত। সেটাই তো সংগত। সেই তো শোভন। সেই হোচ্ছে সমীচীন। কিন্তু লেখার জন্য টাকা এবং কেবল টাকার জন্যেই লেখা—এ দুই কোনও কালেই এক নয়; পৃথিবী জুড়েই লেখকের উপন্যাস সিনেমা হোয়েছে এবং লেখক তার জন্যে পেয়েছে পারিশ্রমিক। এদেশেও তার ব্যত্যয় হবে কেন? সে রকম উপন্যাস লেখা হোয়েছে বোলেই সিনেমা সম্ভব হোয়েছে এতোকাল। কিন্তু উপন্যাসের জন্যে সিনেমা আর সিনেমার জন্যেই শুধু উপন্যাস রচনা কি এক? না। সিনেমার লেখক আর সাহিত্যের লেখক কোনো-দিনও এক ছিলো না। এক হয়নি। আজ কিন্তু তারা এক নয় শুধু, একাকার হোতে বোসেছে! সিনেমার জন্যে নয়, সিনেমার কাগজের জন্যে।

সিনেমার কাগজই আজ বহুবিকৃত বাঙলা কাগজ। সাহিত্যকেও সে আর অবিকৃত থাকতে দিতে রাজি নয়। সে জানে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয়না। টাকা ছড়ালে লেখকেরও। বিশ পাতার যে কোনও রচনাকেই তাই উপন্যাস বোলে চালাতে দিতে আপত্তি আছে এমন লেখকের সংখ্যা খুব কম। যে দু-একজনের মুখে ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা যায়, তৎক্ষণাৎ তাকেও মোটা টাকার মরীচিকায় নিয়ে গিয়ে মজাতে মুহূর্তমাত্র। এককালে শুধু লেখারই মুখবন্ধের প্রয়োজন হোতো; এখন লেখকেরও মুখবন্ধের প্রয়োজন হোচ্ছে। লেখার মুখবন্ধ রচনা করেন লেখক নিজেই; বইয়ের গোড়াতে লিখে দেওয়ার প্রয়োজন ঘোটতো আগাগোড়া বইয়ের দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে পাঠককে প্রস্তুত করবার কারণেই। এখন লেখকের মুখ বন্ধ করে সিনেমা কাগজের মালিকরা টাকা দিয়ে। যে লেখকের বাজার আছে, বাজারে সে যাতে সিনেমার কাগজে লেখার বিরুদ্ধে একটি আওয়াজও না তুলতে পারে—সেই কারণেই তার চোখের ওপর চলে এই কালোটাকার কুচকাওয়াজ। তারপর এক সময়ে তার আর টাঁ ফুঁ শোনেন না। বরং সে তখন বোলে বেড়ায়, সাহিত্যের কাগজ আমাকে কি দেয় এমন? তার-চেয়ে সিনেমার কাগজ আমাকে ঢের বেশী দেয়। এই দেওয়ার-নেওয়ার রাস্তাতেই সিনেমার কাগজের প্রেমে সাহিত্যের ইন্দ্রপতন আজ আর বিরল নয়, হামেশাই ঘোটছে।

এর জন্যে সিনেমার কাগজের মালিককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে চাইবেই তার কাগজের বিক্রি বাড়ুক। এবং বাড়াবার জন্যে যদি শুধু হিরোইনের সায়া দেখিয়ে না হয় তাহোলে সাহিত্যের যাঁরা মেসায়া বর্তমানে তাঁদেরও ডাক পাড়ো। মনোহারিণীদের ছবির সঙ্গেই তিনখানা উপন্যাস ছাপো। যাতে লেখা যায় একথা যে, এই উপন্যাসগুলি বই হোয়ে বেরুলে তার প্রত্যেকটার দাম যা হবে তার চেয়ে অনেক কমে সবকটি উপন্যাস প্লাস হিরো-হিরোইনের চুলের বিন্যাস এই একখানা কাগজেই মাত্র পাবেন; অতএব.....!

দোষ সেই লেখকের যিনি নিজেকে বিক্রি কোরছেন এই বিকৃতির পায়ে। শুধু টাকার জন্যে লিখলেও, বলার ছিলো না, যদি সেগুলি উপন্যাস হোতো বা উপন্যাস হবার এতোটুকু চেষ্টা থাকতো সেগুলির। তার চেয়ে বেশী টাকা নিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট রচনা দেবার কারণেই লেখকরা ঘৃণার পাত্র, কেবল করুণার পাত্র নয় আর। শুধু তাও নয়, এতে শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঠকছেন লেখকরা কারণ, একখানা উপন্যাস যখন ধারাবাহিকভাবে মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয় তখন সে লেখা অনেক পাঠক পাঠিকাই বই হোয়ে বেরুলে একসঙ্গে পড়বার অপেক্ষায় থাকেন। তাতেই মাসিকে বেরুতে বেরুতে যদি কানাকানি হোতে থাকে যে লেখাটি ভালো হোচ্ছে তাহোলে বই হোয়ে বেরুলে তার বাজার আছেই। কিন্তু এক্ষেত্রে সিনেমার কাগজে একসঙ্গে একসংখ্যায় পুরো বইটি বেরুবার ফলে সিনেমার কাগজের বিপুল পাঠিকা সেটি পড়ে ফেলছে, এবং বই হোয়ে বেরুবার পর লাইব্রেরীকে বাধা দিচ্ছে বই কেনায় উৎসাহিত হোতে।

কিন্তু আজকের পেশাদার বাঙালী লেখক এতো দূর চিন্তা কোরতে পারলে ল্যাঙটপরা অবস্থায় আত্ম-প্রকাশ কোরতে পারতো না এসব কাগজে। নগদ বিদায়ের ব্যাপারে বাঙালীতে আর কাঙালীতে আজ তফাত কোথায়? কাঙালী বিদায়ের অপর নামই তো আজ বাঙালী (লেখক থেকে সব) বিদায়!

তিন

আজকের পেশাদার বাঙালী লেখক আর সৎ থাকছে না। বাঙালী প্রকাশক আর সৎ নেই। এই অসৎ লেখক-প্রকাশকের দলকে সায়েস্তা করবার জন্যেই দেশে-দেশে কালে-কালে প্রয়োজন সৎ সমালোচকের। কিন্তু আজ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যেমন নেতা নেই একজনও; আছে অভিনেতা, তেমনই আজকে এদেশে সমালোচনা হোচ্ছে আসলে সেই বস্তু, শিবরাম চক্রবর্তীর উক্তিতে, 'যার মধ্যে আলোর ভাগ অল্প, চোনার ভাগ বেশী।' সমালোচনার নামে এখন দেশের এবং দলের লোক হোলে তার জয়গান, না হোলে তার সম্বন্ধে হয় কটূক্তি—নয় সাহিত্য-সমালোচনা যা হয় তা আরও ভয়াবহ। কোন-কোনো লেখক নিজেই নিজের সমালোচনার নামে নির্লজ্জ আত্মপ্রশংসা লিখে নিয়ে গিয়ে ছাপিয়েছে—এর নজীর কিতাবপট্টিতে এমন কেউ নেই যার অজানা।

সৎ সমালোচক যদি বা কেউ থাকেন, তিনি সমালোচনার কালে সততা অবলম্বন কোরলে এদেশের কাগজে বেশীদিন আর থাকেন না। সৎ সমালোচক কাকে বলে, সেটা এখানে জনান্তিকে বোলে রাখা দরকার। সমালোচক নামে বাঙলাদেশে একদল আছেন যাঁরা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার অনাবশ্যক দায় এঁরা নিজেরাই নিজেদের ওপর ন্যস্ত কোরেছেন। এঁরা সমালোচক নন, এঁরা আসলে সাহিত্যের শনি। এঁদের মাথায় সরস্বতীর অভিশাপের অশনিপাত আসন্ন হোয়ে এসেছে। সমালোচনার ধর্ম হোচ্ছে সাহিত্য থেকে মন্দটুকুকে ছেঁকে, ভালোকে আলোয়ে বেরুবার পথ কোরে দিয়ে সত্যিকারের সৎ লেখা দেশব্যাপী আলোচনার জন্যে প্রস্তুত করা। কোনো বই অশ্লীল হোয়েছে অতএব তা সাহিত্য হয়নি—এ যে বলে, সে সমালোচক নয়। যে সমালোচক, সে বলে, এর বদলে, অমুক বই সাহিত্য হয়নি অতএব অশ্লীল। যোগ্য অথচ অবহেলিত লেখাকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অযোগ্য অথচ পুরস্কৃত লেখার মুখোস খুলে ধরাই সমালোচকের ধর্ম। সমালোচকের অপর কোনো ধর্ম নেই। সবই তার পক্ষে পরধর্ম এবং ভয়াবহ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, এই হোচ্ছে সমালোচকের সবল ধর্মবিশ্বাস।

এই সমালোচকের সিংহাসন আজ শূন্য। তার দায় আজ পাঠককে তুলে নিতে হবে নিজের দায় বোলে। সততার শুল্ক সাহিত্যের কাছ থেকে আদায় কোরতে হবে আজ পাঠককে। জাতসাহিত্যের জয়ধ্বজা বহন কোরতে হবে তাকেই। সাহিত্যে শুধু লেখকেরই দেয় নেই; পাঠকেরও আছে। উপাদেয় সাহিত্যের জন্ম-লালন এবং বাড় নির্ভর করে শুধু লেখকের উপর নয়, পাঠকেরও ওপর। 'পথের পাঁচালী'র মত ছবি দেখাবার জন্যে চাই উত্তম প্রদর্শক যেমন, তেমনই দেখবার জন্যে চাই যথেষ্ট দর্শক। ভালো বই লেখে যে—সেই লেখক। ভালো বই যে লেখায়—সেই হোচ্ছে পাঠক।

আমি জানি, আমি জানি যে, পাঠকমাত্রই প্রশ্ন তুলবেন যে, তাঁরা কি ভাবে এই দুরূহ গুরুভার বহন কোরতে সক্ষম। যদি এই প্রশ্ন একজন পাঠকের মনেও জাগাতে পারি তা হোলেই এ রচনা তখন আর রম্যরচনা নয়; এ রচনার তখনই, তৎক্ষণাৎ জন্ম সার্থক। কারণ আমি জানি, প্রশ্নের অঙ্কুর থেকেই একদিন সমাধানের সজীবতার আবির্ভাব ঘটে উত্তরকালে। যদি কোনো পাঠক বলেন যে তাঁরা দুচারজন অবহিত হোলে বা আপত্তি জানালে শুনছে কে, তাহোলেও আমি বোলবো আমি জানি, আমি জানি এ উক্তি সত্য নয়; আমার বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য। দুচারজন লোক ঘরে বোসে একদিন যা ভাবে তাই তো একদিন ঘরে-বাইরে দেশ-সুদ্ধ লোককে ভাবায়। দুচারজন লোক একদিন ইংরেজের শিকল কাটার কথা ভেবেছিলো বোলেই আজ ইংরেজে রাজত্বের সূর্য শেষ পর্যন্ত পাটে বোসতে বাধ্য হোলো।

বাঙলা বইএর পাঠক এখনও মূলতঃ লাইব্রেরীর পাঠক। বাঙলা বইয়ের বৃহত্তম ক্রেতা আজও লাইব্রেরী। কিন্তু বই বেরুনো মাত্র বিনা বিচারে, নির্বিচারে সমস্ত বই-ই কিনতে যে পারে সেই শুধু লাইব্রেরী,—লাইব্রেরী

সম্পর্কে এর চেয়ে বড় লাই আর কি হোতে পারে। লাইব্রেরীর কাজ কেবল বইএর লিস্ট তৈরী করা নয়; পাঠক তৈরী করাও বটে। এই লাইব্রেরী-সভ্যদের গড়তে হবে পাঠক-চক্র। কিতাবপট্টীর সমস্ত বজ্জাত লেখক এবং অসৎ প্রকাশকের চক্রান্ত ভেদ কোরতে পারে কেবল এই পাঠক-চক্র। কেবল মাত্র দর্শনধারী পুস্তককে কেটে কুচি কুচি কোরতে পারে পাঠ-চক্র নয়, সুদর্শন চক্র।

বাঙালী লেখক আজ মলাটনির্ভর। বাঙলা বই মলাট-নির্ভর। বাঙলা বইয়ের মলাটে আজ মাদুর, বালি, রাঙতা, মখমল, ছাপাশাড়ির মত ফ্লুরেসেন্ট প্রিন্টিংএর ছাপ কিছুই বাদ নেই। বরবাদ হোয়ে গেছে শুধু ভেতরের বস্তু। কিন্তু যা চকচক করে তাই যেমন সোনা নয়, তেমনই যার মলাট ঝকঝক করে তাই-ই কিছু বই নয়। অথচ এই মলাটটুকুর জন্যে বইয়ের দাম একটাকা বেশী দিতে হোচ্ছে লাইব্রেরীকে, ছ মাসের আগেই যে মলাট খোসে গিয়ে দপ্তরীর হাতে যার চিরন্তন লাইব্রেরী মোড়ক ফিরে আসছে আবার। এই অতিরিক্ত দাম কেন দেবে লাইব্রেরীর সভ্য, কোনো পাঠক কখনও কি এ প্রশ্ন তুলেছে? না। তোলেনি। তোলেনি, তার কারণ আজকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানাতে বিস্মৃত হোয়েই জীবিকার প্রতিযোগিতা থেকে বরবাদ হোয়ে যাচ্ছে যে সেই বাঙালী। সাধক-কবি রাম-প্রসাদ গান বেঁধেছিলেন : 'আবাদ করলে ফলত সোনা'। আজ বাঙালীর দুর্দশা নিজের চোখে দেখে যেতে পারলে নূতন কোরে গান বাঁধতেন তিনি। 'আবাদ কোরলে ফলতো সোনা', নয়, তিনি এখন গাইতেন; প্রতিবাদ কোরলে ফলতো সোনা।

জীবনের আর আর ক্ষেত্রের সঙ্গে কখনই এক নয় বই। বইএর জগৎ হোচ্ছে আসলে জীবনের কুরুক্ষেত্র। এবং জীবনের কুরুক্ষেত্রে যোগ্যের সঙ্গে অযোগ্যের নয়, কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয় কেবল। এখানে শিখণ্ডীকে খাড়া করা যায় কিন্তু তার দিকে তীর ছোঁড়া যায় না। জীবনের কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথ চালাবার জন্যে শুধু সারথিতে চলে না, তাকেও পার্থসারথি হোতে হয়। তেমনই বই লিখলেই যেমন একজন লেখক নয়, তেমনই বই প্রকাশ করে—মাত্র এই কারণেই একজন প্রকাশক নয়। (ধনী দপ্তরী আর প্রকাশকে কিতাবপট্টীতে আজ তফাত কোথায়?)। ঠিক এমনই, সব বই রাখে বোলেই তা লাইব্রেরী নয়, বই পড়ে বোলেই একজন পাঠক নয় যেমন।

প্রকাশক হোচ্ছে সেই, যে শুধু বই নয়, বইএর লেখককেও প্রকাশ করে। পুস্তক প্রকাশ করা তার এক-মাত্র করণীয় নয়। পুস্তক-রচয়িতার আত্মপ্রকাশের রাজপথ প্রশস্ত করা তার আরও বড় কাজ। নবীন লেখক সে নয় যে নতুন লিখতে আরম্ভ কোরেছে। নবীন লেখক সে-ই, যার লেখা নতুন জাতের। লাইব্রেরী নয় তা কিছুতেই, যে বই কিনে তবে পড়ে; লাইব্রেরী হোচ্ছে সেই—যে বই পোড়ে তবে কেনে। পাঠক হোচ্ছে সেই—যে ভালো বই পাঠ করে এবং মন্দ বই লোপাট কোরতে সাহায্য করে।

এখানে ভালো বই বোলতে অনেকে ধর্মপুস্তক মনে করে, মন্দ বই বোলতে বোঝে গোয়েন্দা-পুস্তক। আমি তা বুঝি না। কারণ এদেশে যত অধর্ম ধর্মপুস্তকের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এত আর কোনো বইএর বেলায় করে না। বরং আমি যা বুঝি তা হোচ্ছে আধ্যাত্মিক বইও লেখার দোষে অত্যন্ত অপাঠ্য হোতে পারে। আবার গোয়েন্দা-পুস্তকও লেখার গুণে সুন্দর হয়। তাই লাইব্রেরীতে ডিটেকটিভ বই না রাখা অত্যন্ত ডিফেকটিভ নির্বাচন-পদ্ধতি। লাইব্রেরীতে রহস্য-উপন্যাসের সঙ্গেই,- একসঙ্গেই যে উপন্যাস জীবন-রহস্যের অতলে ডুব দিতে চায় তাও থাকবে, অর্থাৎ কেনার পর র‍্যাকেই পড়ে থাকবে না। প্রত্যেক সভ্যেরই রহস্য-উপন্যাসের মতই, জীবনরহস্যের অতলে ডুব দেওয়া উপন্যাসও পড়া থাকবে।

বাঙলাদেশের কোনো কাগজেই রিভিউ হয় না, তার কারণ রিভিউ করবার জন্যে সমালোচকের নিজস্ব ভিউ থাকা উচিত। বর্তমানে কারুর যদি সে ভিউ থাকেও ত তার সঙ্গে কাগজের মালিকের ভিউ-পয়েন্ট মিলবে না। কাজেই লাইব্রেরীর পাঠক-চক্রকে নিজেদের মত গড়ে তুলতে হবে, অপরের অভিমত ভিক্ষে করার বদলে। এইখানেই একটা কথা পরিষ্কার কোরে বলা দরকার। বাঙলা ছবি যেমন সুচিত্রা-উত্তম ছাড়া অচল, বাঙালী লেখকদেরও দেখেছি একটি কি দুটি সাপ্তাহিক মাসিক ছাড়া গতি নেই। কারণ এখন এমন হোয়েছে যে এই সাপ্তাহিক এবং মাসিকে লেখা ছাপালে তবেই আপনি লেখক। এখানে লেখা বেরুলেই তবেই তার প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে। এবং নামকরা প্রকাশক ছাপলেই তবেই তা লাইব্রেরী মারফত পাঠকের কাছে পোঁছুতে পারছে। এবং এই সব কাগজে তবেই সমালোচনার নামে যা-তা সার্টিফিকেট ছাপা সম্ভব হোচ্ছে।

এরই বিরুদ্ধে, এই অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানাতে হবে পাঠক-চক্রকে। বোলতে হবে ওই একটি কি দুটি যা ছাপে তাই লেখা নয়; বোলতে হবে ওই সব লেখা নামকরা প্রকাশক বার কোরছে বোলেই তা বই নয়। এবং যেহেতু লাইব্রেরীতে সরকারী সাহায্য যে পরিমাণ নতুন বইয়ের সংখ্যা সে পরিমাণ নয়, সেহেতু বাজারে যে বই বেরুক তা কিনতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নামকরা লেখকের বদনাম করার মত বই বেরুলে তার প্রকাশককে জানাতে হবে; যে কাগজে প্রকাশিত সেখানে চিঠি দিতে হবে। অযোগ্য বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রতি নির্মম পত্রাঘাত কোরতে হবে সমালোচনাকারী কাগজেই। তারই সঙ্গে হঠাৎ এমন কোনো বই যদি হাতে এসে পড়ে যা তথাকথিত খ্যাত-নামা লেখকেরই নয়, যা অখ্যাত কাগজে এবং অবজ্ঞাত প্রকাশক কর্তৃক পরিবেশিত যদি তার মধ্যে কোনো বস্তু থাকে তবে তা সর্বসাধারণের গোচরে আনবার জন্যে সক্রিয় হোতে হবে পাঠক-চক্রকে। লাইব্রেরীতে কেনালেই হবে না কেবল, পড়াতে হবে সকলকে। আজকের দিনে নকলের বিরুদ্ধে বাঁচতে হোলে আসলেরই বিজ্ঞাপন দরকার বেশী।

সরকারী পুরস্কার যেমন সাহিত্যিককে উৎসাহ দানের জন্যে, পাঠক-চক্রের প্রয়োজন সাহিত্য-তিরস্কারের জন্যে। সাধু সাহিত্যকে পুরস্কার দেওয়া যেমন কর্তব্য, তেমনই সাহিত্যে এবং সাহিত্যিকের মধ্যে যা অসাধু তাকে সাধুবাদ না দিয়ে তিরস্কার দেওয়াও অবশ্য কর্তব্য। একই বই, নাম পালটে নতুন বই বোলে চালাবার অপচেষ্টা; একই নামে বিভিন্ন বই প্রকাশ করার দারিদ্র্য, বড় গল্পকে উপন্যাস বোলে চালাবার জন্যে পাতার চারপাশে অতিরিক্ত ফাঁক দেওয়ার ফাঁকি, ভেজাল সংস্করণের ধোঁকাবাজি—এসবেরই বিরুদ্ধে সজাগ হোতে হবে আজ সমালোচকের অভাবে পাঠকেরই। সরকারী পুরস্কার দেশের চক্রান্তে, দলের চক্রান্তে, অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হোলে তার বিরুদ্ধেও দ্বিধাহীন প্রতিবাদ সোচ্চার কোরে তুলতে হবে।

যদি বলেন যে প্রতিবাদ পত্রস্থ কোরবে কে, তাহোলে বলি, প্রতিবাদ যদি তেমন মোক্ষম হয় তাহোলে পত্রস্থ করবার মত পত্রিকা না থাকলে নতুন পত্রিকার জন্মলাভ হবে। সেদিন দূরে কিন্তু অনেক দূরে নয়।

নমিত বালক। লেনিনগ্রাড।

ভাস্কর, চিত্রকর এবং কবি

শুভেন্দু ঘোষ

সংখ্যায় পরিমিত লিখলেও **রচনার** চিন্তাশীলতার জন্য শুভেন্দু ঘোষ মননশীল পাঠকের মধ্যে সুপরিচিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি 'শিল্পদর্শনের ভূমিকা' নামে একটি বই বেরিয়েছে।

অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে যাঁরা আসেন, সাধারণ লোকে তাঁদের ভুল বোঝে। তাঁরা আর দশজনের মত নন বোলেই লোকে তাঁদের ঠিকমত বোঝে না; আর প্রাণ বা চিত্তের কোনো কোনো বৃত্তির অসাধারণ বিকাশের ফলেই তাঁরা স্বতন্ত্র ও অসাধারণ হোয়ে পড়েন। সাধারণ মানুষ তাঁদের আসল রূপটা ঠিকমত ধোরতে পারে না বোলেই মন-গড়া একটা রূপ তৈরি করে নেয়। তাঁদের কখনো দেবতা বানায়, কখনো বা দৈত্য। মাইকেলেঞ্জেলো বরাবরই সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন, কিন্তু সে-শ্রদ্ধার পিছনে রোয়েছে ভুল-বোঝা। লোক-মানসে তিনি যে ভাব-রূপ পেয়েছেন, সেটা যেন তাঁরই সৃষ্ট কোনো সিবিল-এর—এরিথ্রিয়া কি কুমীর গুহামন্দিরের কোনও ভবিষ্যদ্বাদিনী 'দেয়াসিনী'র। তাঁর মুখ দিয়ে ঝাপ্‌টায় ঝাপ্‌টায় যে-সব বাণী বেরিয়ে আসে সেগুলি যেন ব্রোঞ্জে রূপায়িত হবার প্রতীক্ষাতেই বেরোয়, কিংবা সেগুলি এতই অস্পষ্ট যে, ঝুড়ি ঝুড়ি টীকা-টিপ্পনী ছাড়া তাদের কোনও অর্থ ধরা সম্ভব হয় না।

লোকে মনে করে, যাঁরা বড়, তাঁরা সর্বক্ষণই বড়, যাঁরা প্রতিভাবান্, তাঁরা সর্বদাই প্রতিভাবান্; মাইকেলেঞ্জেলো ছিলেন বড় ভাস্কর, বড় চিত্রকর, সুতরাং ছেনি বা তুলি নিয়ে পাথর-কাটা বা রঙ-বসানো ছাড়া, তাঁর জীবনে আর-কোন কাজই ছিল না! আর দশজনের মত তাঁর সুখ-দুঃখ ছিল না, শখ-আহ্লাদ ছিল না! লোকের এরকম মনে করা ভুল। যাঁরা বড়, তাঁরাও মানুষ—আর দশজনের মতই মানুষ; শুধু প্রাণ বা চিত্তের বিশেষ কোন বৃত্তির অসাধারণ বিকাশের দরুন, আর দশজনের চেয়ে তাঁরা দেখেন বেশী, শোনেন বেশী, অনুভব করেন বেশী। বিশ্বভুবন তাঁদের মনকে নাড়া দেয় বেশী কোরে, চমক লাগায় বেশী কোরে। এই বেশী নাড়া-পাওয়ার স্বাদ, এই চমকের স্বাদ তাঁরা অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত কোরতে চান—তাই করেন সৃষ্টি—শিল্প-সৃষ্টি। বিধাতার সৃষ্টিকে তাঁরা মানুষের কাছে নতুন কোরে ধোরে দেবার চেষ্টা করেন। প্রতিভার মধ্যে বিস্ময়ের বস্তু হোল এই যে, তা, ক্বচিৎ কখনো আচম্বিতে মানুষকে একটা ঊর্ধ্বলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; চোখের উপর থেকে প্রাত্যহিক অভ্যস্ত দৃষ্টির পর্দাটা অকস্মাৎ সরিয়ে দিয়ে পলকের জন্যে বিশ্বের অন্তরতর আনন্দময় রূপের সঙ্গে পরিচয় করায়। নতুন চোখে দেখার এই ঘোরটা যতক্ষণ থাকে, ধ্যানের দ্বারা সে ঘোরকে মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনা চলে, ততক্ষণ শুধু ভাগ্যবান মানুষটি আর দশজনের মত থাকেন না হয়তো, কিন্তু বাকী সময়টা তিনি সত্যিই সাধারণ; তখনও অবশ্য তিনি অসাধারণত্বের মুখোস লাগিয়ে চলতে পারেন।

অপূর্ব প্রতিভা থাকলেও মাইকেলেঞ্জেলো ছিলেন আমাদের এই মাটির পৃথিবীরই মানুষ। মাটির উপর দাঁড়িয়েই তাঁর প্রতিভা স্বর্গলোক ভেদ কোরেছিল।

সুপ্রতিষ্ঠ ভাস্কর ও চিত্রকর হোয়েও মাইকেলেঞ্জেলো কবিতা লিখতে গিয়েছিলেন কেন? সে-যুগে কবিতা লেখা একটা ফ্যাশন হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো; সেইজন্যে কি? তাঁর কিছু কবিতার মধ্যে দিয়ে বোয়ে গেছে তাঁর জীবন-স্মৃতির ধারা; কিছু কবিতা তিনি লিখেছেন কর্তব্যের অনুরোধে; বেশীর ভাগ কবিতাই কিন্তু রচিত হোয়েছিলো অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণায়, প্রাচীরচিত্রে, ভাস্কর্যে বা স্থাপত্যে তিনি যে ভাব-বেদনাকে রূপ দিতে পারেন নি, তাকে প্রকাশ করার তাগিদে।

চিত্রে বা ভাস্কর্যে, মাইকেলেঞ্জেলো তাঁর ভাব-বেদনাকে যথেষ্ট রূপ দিতে পারেন নি?—হ্যাঁ পারেন নি। এ কথা চমক-লাগানো হোলেও সত্যি। বড় শিল্পীমাত্রেই তীব্রভাবে বোধ করেন, যা তিনি বোলতে চেয়েছেন, তার কতটুকু পেরেছেন বোলতে। মহতেই বোঝেন, তাঁর ত্রুটি কোনখানে। মহতেই জানেন, তিনি যা কোরতে চেয়েছিলেন, যা করার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ কোরেছিলেন, তার তুলনায়, যা কোরতে পেরেছেন তা কত তুচ্ছ। মহান্ শিল্পীর পরাজয়ের এই যন্ত্রণাই তাঁর শিল্প-কর্মকে দেয় তার মহিমা—তার উদাত্ত সুর। লোকে সে শিল্প-কর্মকে নিখুঁত মনে কোরলেও শিল্পী তাকে ব্যর্থ বোলেই মনে করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মাইকেলেঞ্জেলো লিখেছিলেনঃ

"এত বুদ্‌বুদ সৃষ্টি কোরে কি লাভ কোরল আমার উচ্চাভিলাষ? তারা তো আমাকে এনেছে সেই এক

অ্যাডামের সৃষ্টি। সিস্তিন চ্যাপেল।

মাইকেলেঞ্জেলোকৃত একটি মর্মরমূর্তি। ফ্লোরেন্স, ক্যাথিড্রাল

অন্তে, সাগর পার হোয়ে এসে এসে খালের জলে যে-জল ডুবে মরল তারই মত।"

তাঁর সৃষ্ট মুসার মূর্তি, গোলামদের মূর্তি!—সে-গুলিও নাকি বুদবুদ্! শিল্পীরা যদি একটির বেশী প্রকাশ-মাধ্যম না থাকে, তাঁকে যদি শুধু ছেনি, শুধু কলম বা শুধু তুলি নিয়ে অন্তরে-পাওয়া অনুপম আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা কোরতে হয়, তাহ'লে তাঁর অসহায়তা আরও উৎকট হোয়ে ওঠে। পূর্ণভাবে বাঁচার জন্যে সুস্থ মানুষের যেমন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়েরই প্রয়োজন হয়, অন্তরের আদর্শ সুন্দরকে সম্যক্‌ভাবে রূপ দেওয়ার জন্যে শিল্পীর তেমনি পাঁচটি শ্রেষ্ঠ কলারই দরকার হোতে পারে। পাথর কেটে মূর্তি বা'র কোরে যা বলা গেল না, তা বলার চেষ্টা কোরতে হয় পটের উপর তুলি বুলিয়ে। তাতেও যদি ঠিকমত বলা না হয়, বলার জন্যে আছে কবিতা। কবিতাও যদি সেই অনির্বচনীয়ের আভাস দিতে না পারে, শেষ পর্যন্ত হয়তো সংগীতে পারা যায়। তাই দেখি দান্তে বাজাতেন, ছবি আঁকতেন; গিয়োত্তো আর চেল্লিনি কবিতা লিখতেন; উগো ছবি আঁকতেন; নীৎশে কবিতা লিখতেন, সংগীত রচনা কোরতেন; আমাদের রবীন্দ্রনাথ ছবি এবং সংগীতেরও ভজনা কোরতেন। অনঙ্গকে যে-ভাবেই হোক্ অন্তর থেকে বাইরে আনতে হবে, অঙ্গায়িত কোরতে হবে! ভাস্কর ও চিত্রকর মাইকেলেঞ্জেলো কবিতা লিখতেন এই তাগিদে।

বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের যেটুকু আভাসে-ইঙ্গিতে তাঁর চিত্তকে উন্মেল কোরেছিল তারই রেশ ধোরে রাখার জন্যে মাইকেলেঞ্জেলো শেষ পর্যন্ত শরণ নিয়েছিলেন কবিতার। মর্মরখণ্ডে বা প্রস্তর-প্রাচীরে যা তিনি রূপায়িত কোরতে পারেন নি, তাকেই তিনি বন্দী কোরতে চেয়েছিলেন ছন্দিত ভাষায়; প্রেমের মধুর জ্বালাকে, দেহ এবং আত্মার মৃত্যুসংক্রান্ত চিন্তাকে, বৃথা-যাওয়া জীবনের জন্যে অনুতাপকে। একেবারে প্রথমদিকের প্রস্তর-মূর্তিগুলিতে তিনি মানবীয় প্রেমের একটু-আধটু আভাস হয়তো বা দিতে পেরেছিলেন; পরের কোনো মূর্তিতেই পারেন নি। তাঁর ডেভিডে প্রকাশিত হোয়েছে সৈনিকপুরুষের শক্তি, মুসায় রূপায়িত হোয়েছে পয়গম্বরী শক্তি, লোরেঞ্জোয় প্রকট হোয়েছে শাসককুলের বিষণ্ণতা আর গোলামদের

ডেভিড। ফ্লোরেন্স অ্যাকাডেমি।

মূর্তিগুলিতে রূপ পেয়েছে বন্দীদের নিরানন্দতা। মেদিচি গির্জায় চিত্রিত হোয়েছে শুধু অশান্তি, লোভ আর হতচেতনা, সিস্তিন্ গির্জার সৃষ্টি আর শেষ-বিচারের বিজয়। মানবীর প্রেম, মৃত্যু-চিন্তা বা অনুশোচনা প্রকাশের অবকাশ পাওয়া যায় নি এ সবের মধ্যে। অথচ নর এবং নারীকে তিনি ভালবাসতেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। হাঁ, নরকেও, নরের দেহ-সৌন্দর্যকেও। প্রমাসো দা কাভালিয়েরিকে উদ্দেশ কোরে তিনি বলেছিলেন :

"তোমার ঐ কমনীয় মুখ থেকে আমি যা ব্যাকুল-ভাবে পেতে চাই, যা শিখি—পার্থিব মন তা ভুল বোঝে। যে এটাকে জানতে চায়, তাকে প্রথমে মরতে হবে।"—(অর্থাৎ দেহাত্মিকা বুদ্ধি ত্যাগ কোরতে হবে।)

মাইকেলেঞ্জেলোর নর-প্রেম ছিল নরকে ভগবানের আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টি বলে ভালবাসা।

আর-এক জায়গায় তিনি বোলছেন : "ঐ বেইমান-গুলি, নির্বোধ, হিংসুটে লোকগুলি যদি আমাদের কাজকে লক্ষ্য কোরে বিদ্রূপ করে, আঙুল দেখায়, তাতে কি; প্রেম, বিশ্বাস আর আন্তরিক অভীপ্সা থাকলে,

ব্যাকুল ইচ্ছার মূল্য তাতে একটুও কমে না।" মাইকেলেঞ্জেলোর প্রেমে যে সর্বদাই একটা যন্ত্রণার ভাব, একটা বিষাদের ভাব থাকত, তার কারণ তাঁর সত্তার এই স্বভাব যে, অল্পে তা তৃপ্ত হোতে পারত না; হয়তো বা ঐ 'বেইমান'দের ভুল-বোঝাও।

মাইকেলেঞ্জেলোর চিত্রকর্মে প্রকৃতি ক্বচিৎ কদাচিৎ একটু স্থান পেয়েছে। সমস্ত স্থানই ভোরে তোলা হয়েছিল মানুষ-মূর্তি দিয়ে। কবিতায় তিনি তাঁর এ ত্রুটি শুধরে নিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে অষ্ট-পদীগুলি রচনা কোরেছিলেন সেগুলিতে তিনি পল্লী-জীবন সম্বন্ধে মুখর। প্রথম দিকের কবিতাগুলিতেও

শিশুসহ ম্যাডোনা। বার্লিন মিউজিয়াম।

প্রকৃতি একেবারে উপেক্ষিতা হয় নি, রাত্রির উদ্দেশে তিনি যে সনেট লিখেছিলেন তাতে দেখি :

"অজস্র বিভিন্ন বীজ ও চারাতে অনুপ্রবেশকারী রৌদ্র চলে গিয়েছে যে মাটির উপর দিয়ে, দুঃসাহসিক কৃষক তার হল দিয়ে তাকে পীড়ন করছে।"—কৃষক এখানে পেয়েছে হলধর সৈনিকের রূপ, অন্নজয়ের জন্যে তার অভিযান।

মহাকবি দান্তের জন্যে তিনি যোগ্য সমাধি নির্মাণ কোরতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর উদ্দেশে তিনি যে সনেটগুলি লিখে গিয়েছেন, সেগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ সনেট-গুলির মধ্যে পড়ে। কাব্যের ভাষার জন্যে তিনি দান্তে ও পেত্রার্কের নিকট নিঃসংশয়েই ছিলেন ঋণী; দান্তের সে-ঋণ তিনি এই সনেটগুলি রচনা কোরে অনেকটা পরিশোধ করেছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে মাইকেলেঞ্জেলো যখন পাথর কাটতে পারতেন না, তখন তিনি যে-সব কবিতা লেখেন সে-গুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে রজনী-প্রীতি, মানব-ত্রাতা যীশুখৃষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সংসারের মিথ্যা মায়ার পিছনে ঘুরে বৃথা কালহরণের জন্যে অনুতাপ, আর বিশেষতঃ প্রত্যাসন্ন মৃত্যু। চিরন্তন সুন্দরকে কঠিন প্রস্তরে বন্দী কোরে মৃত্যুকে জয় করার আশা তিনি বরাবরই কোরেছিলেন। তিনি জানতেন, পাহাড়ে বন্দী হোয়ে আছে মূর্তি আর দেহে বন্দী হোয়ে আছে আত্মা। পাহাড় কেটে ভাস্কর যেমন তার আরাধ্যকে প্রকাশ করে, পরম শিল্পী ভগবান তেমনি দেহকে নষ্ট কোরে আত্মাকে দেন মুক্তি। তাই মৃত্যুচিন্তা রোয়েছে তাঁর সকল কবিতারই পিছনে। প্রেমের গান কোরতে গিয়েও তিনি মৃত্যু-চিন্তাকে এড়াতে পারেন নি :

"আত্মা আমার মৃত্যুর সঙ্গে আলাপ করছে, দুজন বসে পরামর্শ করছে।...আজ আমি শ্রান্ত, আমার শেষ কথার কাছাকাছি এসে গিয়েছি; তাই মৃত্যুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছি আমি।"

শোনা যায়, তাঁর বাড়ীর সিঁড়ির মাঝপথে তিনি একটা কঙ্কাল এঁকেছিলেন; খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে কঙ্কালটা, তার কাঁধে একটা শবাধার। ঐ শবাধারের উপরে তিনি নাকি লিখেছিলেন :

পিরেতা। রোম, সেন্ট পিটার্স।

"তোমরা, যারা তোমাদের আত্মা, দেহ ও মনকে সংসারের হাতে সমর্পণ করেছ, তাদের আমি বলছি, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সিন্দুকে রয়েছে তোমাদের উত্তরা-ধিকার।" এরপর, মৃত্যুচিন্তাই তাঁকে ঐরূপ লিখিয়ে-ছিল এমন অনুমান করা অন্যায় বা অসংগত হবে কী?

মৃত্যুচিন্তা থেকে স্বভাবতঃই জন্মায় ভগবদ্-চিন্তা। সে ভগবান শুধু পিতা নন, বিচারকও। সিস্তিন গির্জার প্রাচীরে তিনি এই বিচারক খৃষ্টকেই রূপ দিয়েছিলেন। এই বিচারক খৃষ্টের কাছে ভয় পায় না শুধু সন্তরা। মাইকেলেঞ্জেলো সন্ত ছিলেন না।

তাই তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে খৃষ্টের কাছে আকুল আবেদন :

"প্রভু, আজ আমার প্রয়োজনের ক্ষণে, আমার দিকে প্রসারিত করে দাও তোমার দাক্ষিণ্যময় হস্ত; আমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নাও, আমাকে তোমার প্রীতিকর করে নাও।"

এ যেন বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবির আকুতি :

"দেঈ তুলসী তিল দেহ সমর্পলু, দয়া জানি ছোড়বি মোয়।" মাইকেলেঞ্জেলোর এই অনুতাপ ও আত্মনিবেদনের কবিতাগুলি ইতালির ধর্মকবিতা-সাহিত্যে অতুলনীয়। চিত্রে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে যার আভাস মাত্র তিনি দিতে পেরেছিলেন, কবিতায় আত্মার সেই শেষকথা তিনি বলে নিলেন। মৃত্যুকে বরণ করার পথে আর কোন বাধা রইল না।

মাইকেলেঞ্জেলোর মধ্যে একাধারে মিলিত হয়েছিল য়িহুদী পয়গম্বর ইশার আর গ্রীক ভাস্কর ফিদিয়াসের অভীপ্সা। এক চোখে তিনি দেখতেন সংসারের ভয়াবহ ত্রিতাপ; আর-চোখে দেখতেন রূপের—বিশেষতঃ মানুষের দেহরূপের মহিমা। নিজ প্রকৃতির এই দ্বন্দ্ব থেকে তিনি বহু যন্ত্রণাই পেয়েছিলেন—তাঁর প্রতিভার মূলে কিন্তু ছিল এই দ্বন্দ্বই। তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মে যে অনির্দেশ্য গাম্ভীর্য পাওয়া যায়, সেটা তাঁর অন্তরের এই দ্বন্দ্বেরই ফল।

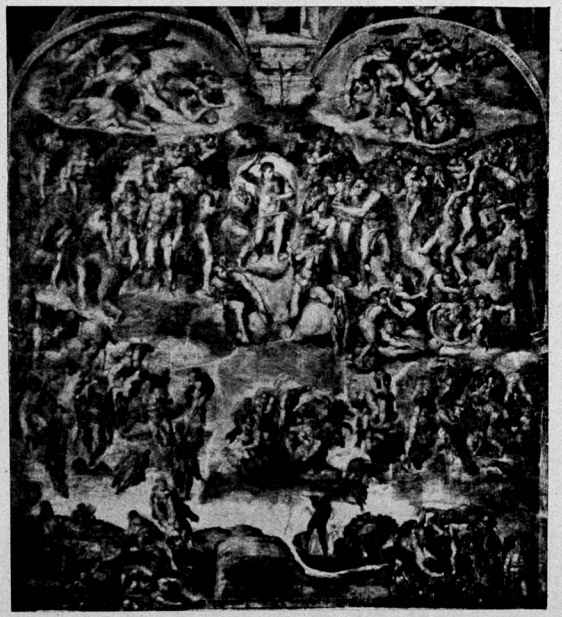

শেষ বিচার।
সিস্তিন চ্যাপেল।
ভ্যাটিকান।

দুটি সার্থক চলচ্চিত্র

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

তরুণ কবি। সমালোচক। প্রবন্ধকার। বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংগ্রহ-গ্রন্থ 'হালকা মেঘের মেলা-র সম্পাদক।' বর্তমানে একটি সরকারী কলেজের অধ্যাপক। এক সময়ে চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ ছাড়া, প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত।

সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছিল। ক্লান্তিশূন্য, বিরামহীন। সঙ্গে ছিল দুরন্ত হাওয়ার উল্লাস, মাঝে মাঝে যার সিক্ত কোমল স্পর্শ এসে লাগছিল চোখে মুখে। বৃষ্টি আর বাতাসের চক্রান্তে সেদিন ছিলাম অন্তরীণ, সেই সঙ্গে সমস্ত রকম কাজের ব্যস্ততাটুকুও তারা কেড়ে নিয়েছিল। তার বিনিময়ে একটা মদির আলসা, অকর্মল ঔদাসীন্যে সারা দেহ মন ভরিয়ে রেখেছিল।

শ্যামকান্তিময়ী সেই শ্রাবণ-সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ প্রহরে বৃষ্টি-মুখর প্রকৃতি-লক্ষ্মীকে দেখতে ভালো লাগছিল। বাংলাদেশে যে প্রকৃতি কথা কয়, কথা কয় নিজস্ব ভাষায় অধিকাংশ-অগম্য কণ্ঠস্বরে, তারই প্রমাণ পেয়েছিলাম সেদিন। মনে পড়ে, স্বপ্নবিভোর মনে অনেকক্ষণ ধরে অবিরাম বৃষ্টির কথকতা শুনেছিলাম।

বৃষ্টির কথকতা বিমুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে আরেকটি বৃষ্টিমর্মর দিন আমার স্মরণে এসেছিল সেদিন। স্মরণ-সুন্দর সেই বৃষ্টির বর্ণনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, মনে আছে, তেমনি মুখর তেমনি জীবন্ত যদিও ভিন্ন পরিবেশে, যন্ত্রের চোখে আর শহর-কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহের কৃত্রিম অন্ধকারে। বাঙ্ময় বাংলার প্রকৃতিকে অকৃত্রিম নিবিড়তায় পেয়েছিলাম যেখানে, বাংলা চলচ্চিত্রের সেই অবিস্মর্তব্য ঘটনার নাম 'পথের পাঁচালী'।

বলতে দ্বিধা নেই, 'পথের পাঁচালী'-ই, প্রথম বাংলা এবং অবশ্যই ভারতীয়, চলচ্চিত্র, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করে তুলেছে। 'পথের পাঁচালী'-র পূর্বে ভালো ছবি যে ভারতে তৈরি হয়নি, তা নয় এবং শক্তিমান চলচ্চিত্রীও যে আবির্ভূত হননি তা নয়, কিন্তু 'পথের পাঁচালী' এমন এক দুঃসাহসী ছবি, এমন এক নতুন জাতের ছবি, যা সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের জাতান্তর ঘটিয়েছে, সৎ শিল্পান্বেষীর কাছে চলচ্চিত্রকে সম্ভাবনাপূর্ণ ও মহনীয় করে তুলেছে। নিজস্ব শিল্পমূল্য ছাড়া এ-ছবি যে আরও একটি কারণে ভারতীয় চলচ্চিত্রে স্মরণীয়, তা হলো এই ছবিটিই সর্বভারতীয় বিশেষত বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন প্রতিভার যাত্রাপথ সহজ ও সুগম করে দিয়েছে। সুদীর্ঘসঞ্চিত অভিজ্ঞতা, আর যেখানেই হোক, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্তত মহত্তম সৃষ্টির পক্ষে যে অপরিহার্য নয়, এই সারাৎসারের স্পষ্ট ঘোষণা

আরেকবার শ্রুত হলো 'পথের পাঁচালী'তে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রদ্ধেয় বিস্ময় 'পথের পাঁচালী'র রচয়িতা বিভূতিভূষণ এবং বিখ্যাত, কিন্তু চলচ্চিত্র-অসম্ভব, সেই উপন্যাসের ততোধিক বিস্ময়কর চিত্রের রূপকার সত্যজিৎ রায়ের সংযোগ দৈবাধীন বা আপাতিক ঘটনারূপে বিস্ময়-চিহ্নিত হয়ে আছে।

'পথের পাঁচালী'র অনুসৃতি 'অপরাজিত' গ্রন্থ থেকে সত্যজিৎ রায় দু'টি ছবি তৈরি করেছেন: 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার', এবং এদের মধ্যে প্রথমটি ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্র-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানলাভে বাংলা তথা ভারতীয় ছবিকে বৈশ্বিকভাবে দর্শনীয় করে তুলেছে। ভারতীয় ছবি সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা, সন্ধিৎসা ও কৌতূহল জাগানোর কাজে 'অপরাজিত' চিত্রের স্মরণ-যোগ্য ভূমিকা মনে রেখেই বলি, ব্যক্তিগতভাবে শেষোক্ত 'অপুর সংসার' আমাকে অধিকতর তৃপ্তি দিয়েছে। 'অপরাজিত' চমকপ্রদ অভিনবত্বে মুগ্ধকর, কিন্তু 'অপুর সংসার' সহজ সারল্য ও গীতল মাধুর্যে অন্তঃস্পর্শী। শিল্পবিচারেও বোধ করি, 'অপুর সংসারে' সত্যজিৎ-প্রতিভা কাঙ্ক্ষিত পরিণতি ও সিদ্ধির সামীপ্য লাভ করেছে।

আমার এ লেখার শুরুর মতো, 'অপুর সংসার'-এরও প্রকৃত সূচনা বৃষ্টির বর্ণনায়। বাংলার বৃষ্টির অন্তরঙ্গ ছবি প্রথম দেখি 'পথের পাঁচালী'তে তার অকৃত্রিম রূপ-মাধুর্যের সমগ্রতায়। সে বৃষ্টি ছিল গ্রাম-বাংলার বৃষ্টি, কিন্তু সেই বৃষ্টির-ই রূপ যে শহরে এসে বদলে যায়, আভাসিত হয় নতুন মাধুর্যে 'পরশপাথর'-এ তার প্রমাণ পেলাম। বর্তমান ছবিতে পুনর্বার দেখলাম সেই বৃষ্টিকে, 'পরশপাথর'-এরই মতো শহুরে বৃষ্টি কিন্তু 'পরশপাথর'-এ মূর্ত বৃষ্টির সঙ্গে প্রভেদবিশিষ্ট। একই শহরের সযত্ন-শালীন প্রাণকেন্দ্রে এবং অবহেলিত বস্তি-অঞ্চলে একই বৃষ্টি যে ভিন্ন রঙে ভিন্ন রূপে দেখা দেয় 'পরশপাথর' ও 'অপুর সংসার'-এর বৃষ্টি-চিত্রে তার প্রমাণ চিরঞ্জীব হয়ে রইল। প্রত্যেকটি নিসর্গ-দৃশ্যেরই যে স্বতন্ত্র চরিত্র, বিশিষ্ট ভাষা ও ভঙ্গী এবং বিচিত্র রূপ রয়েছে, তা দেখার ও বোঝার জন্য দেখার চোখ থাকা দরকার, চোখের দেখাটুকুই সব নয়।

সত্যজিৎ রায়ের এই দুর্লভ দেখার চোখ আছে বলেই আপাত-তুচ্ছ ঘটনা ও দৃশ্যও দূরপ্রসারী গভীরতায় ব্যঞ্জিত হয়। উপস্থিত বাংলার চিত্রজগতে ব্যঞ্জনাগর্ভ, একটু অন্যভাবে প্রতীকী দৃশ্য বা 'শট'-এর অবতারণায় সত্যজিৎ রায় দ্বিতীয়রহিত চলচ্চিত্রী। কলকাতায় অপুর জরাজীর্ণ ঘরটিতে অপর্ণার রোদন-ক্লান্ত চোখে ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে মায়ের সঙ্গে ক্রীড়াশীল মজুর-শিশুকে দর্শন এর একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। অনুরূপ আর একটি দৃশ্যক্রমে অপুর সস্নেহে রেল-লাইনের ধার থেকে প্রতিবেশী মজুরের শিশুটিকে তুলে নিয়ে তাদের খাটিয়ায় বসিয়ে দেওয়ায় অপুর ভাবী পিতৃত্বের আনন্দ-বিহ্বলতা মর্মস্পর্শিতায় মূর্ত হয়েছে। ব্যঞ্জনা-ধর্মিতা ও কম্পোজিশন-নৈপুণ্যের যৌগপাতিক উদাহরণ অর্পণার মৃত্যুর পর বিশ্বসংসারের প্রতি বীতরাগ অপুর ট্রেনের তলায় আত্মহননের ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছার পরাভব, একটি সাহসী শূন্য শাদা ফ্রেম বা দৃশ্য, ট্রেনের ধূম্রাভাস ও ক্রমোচ্চকিত শব্দ, ট্রেনের তলায় শুয়োর কাটা পড়ার দৃশ্য-পারম্পর্যে অপুর বৈরাগ্য ও জীবন-প্রেমের জন্ম যে নৈপুণ্য ও হৃদয়-সংবেদ্যতায় রূপায়িত হয়েছে, তার সমান্তর দেশী বিদেশী খুব কম ছবিতেই আমি দেখেছি। চলচ্চিত্রের মতো যে শিল্পে অন্তর্নিরীক্ষার স্থান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সেই শিল্পেই অন্তর্নিরীক্ষার এমন স্বর্ণিল উদাহরণ পাওয়া গেলো, এটাকে কী সমাপতনের দৃষ্টান্তরূপেই উল্লেখ করবো?

নাঃ, সমাপতনের সুখী দৃষ্টান্ত, আর যাঁর ছবিতেই হোক, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অন্তত আমি আশা করি না। কারণ সত্যজিৎ রায় যে বিশ-শতকী শিল্পজগতের সর্বকনিষ্ঠ সন্ততির ভাষা ও ভঙ্গীর অবিসম্বাদী অধীশ্বর, তাঁর চলচ্চিত্রী জীবনের সূচনাপর্ব থেকেই তার প্রমাণ পেয়েছে বিশ্বের তাবৎ শিল্পরসিক ও সমালোচকবৃন্দ। সত্যজিৎ রায় ব্যক্তিগত জীবনে প্রদক্ষ চিত্রশিল্পী, কম্পোজিশনের কারুতা তাঁর পক্ষে স্বভাবী ঘটনা। সেই সঙ্গে তাঁর রয়েছে অভিজ্ঞ মনন, ভাববার মন, দেখবার চোখ। সুতরাং সমাপতন তাঁর ছবিতে অস্বভাবী ও অস্বাভাবিক; অন্যপক্ষে, তাঁর ছবির অধিকাংশ দৃশ্য ব্যঞ্জনাগর্ভ, এবং প্রতিটি দৃশ্য ও দৃশ্য-ক্রম পূর্ববর্তী দৃশ্য ও দৃশ্যক্রমসমূহের সঙ্গে নিপট অর্থবহতায় অন্বিত। উদাহরণস্বরূপ, 'অপুর সংসারে' নাগপুরের ও অন্যান্য স্থানের নয়নরঞ্জক দৃশ্যাবলী—আপাতদৃষ্টিতে ছবিটি থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট বলে

মনে হয়—বোহেমিয়ান অপুর বিবাগী মনের বিস্তীর্ণ শূন্যতাকে মুখর করে তুলেছে।

শুধু দৃশ্য বা দৃশ্যক্রম নয়, সংলাপের ব্যঞ্জনাবহতার কথাও বলা প্রয়োজন। অধিকাংশ বাংলা ছবিতে সংলাপ বচন ও বচনকৌশলের দৃষ্টান্তরূপেই অঙ্গীভূত হয়, অকারণ অর্থহীনতায় মূল ছবির সঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের যোগ ততখানিই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের সঙ্গে দেশের লোকের যোগ যতখানি। শুধু সংলাপ কেন, আবহসংগীত বা গানের ক্ষেত্রেও একই খেদজনক ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির মতো 'অপুর সংসারে'ও এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখলাম। সংলাপ-প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে ব্যঞ্জনাবহ একটি সংলাপ কলমের গোড়ায় এসে গেল। সিনেমা থেকে ফিটনে করে ফিরে আসার সময় অপু অপর্ণাকে প্রশ্ন করে: 'তোমার চোখে কি আছে?' অপর্ণার সংক্ষিপ্ত আবেদন-গভীর উত্তর: 'কাজল'। 'অপুর সংসারে'র স্রষ্টার রচিত এই দু'টি সংলাপ একদিকে যেমন সার্থক সাহিত্য-রসের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি কাহিনীর পরবর্তী ঘটনার নিপুণ ইঙ্গিত বহন করে।

উপরের অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে গানের কথা বলেছি। এবং গানের কথা মনে আসতেই 'অপুর সংসারে' প্রযুক্ত ভাটিয়ালী গান স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। আলোচ্য ভাটিয়ালী গানটি দর্শক অপু-অপর্ণার ফুল-শয্যার রাতের দৃশ্যে দৃশ্যবহির্ভূতভাবে প্রথম শুনতে পেল। উদাস-করা দূরায়ত সুর তার, দরিদ্র অপুর ফুলশয্যার বিষণ্ণ-মধুর আবহ রচনার সবচেয়ে উপযোগী (সশঙ্কভাবে ভাবছি, এমন একটি লোভনীয় দৃশ্যে অন্য ভারতীয় চিত্র-পরিচালক কি করতেন!) ছবির শেষ দিকে উতল-সুর এই সংক্ষিপ্ত গানটি পুনর্বার শোনে দর্শক; দেখে, দীর্ঘকাল বাদে মৃতদার অপু ফিরে এসেছে সেই ঘরে, যে-ঘরে একদিন তার জীবনের সৌরভচ্ছুরিত পরম-লগ্নটি প্রস্ফুটিত হয়েছিল; সে-দিন যে ছিল, আজ সে নেই। এই নির্মম নাস্তির বিস্তীর্ণ শূন্যতায় অপু সেই ভাটিয়ালী গান শোনে, তার উদাস-করা সুরের সরণি বেয়ে ফিরে যায় কয়েকটি বসন্তের পশ্চাদ্‌ভূমিতে, স্মৃতিভার-জর্জরিত বেদনা-বিহ্বলতা তার সমগ্র সত্তায় পরিকীর্ণ হয়। এই বেদনা-বিহ্বলতা শুধু কী অপুর একার? সমগ্র দর্শকসমাজও কি ইতিমধ্যেই তার দুঃখ-বেদনার অংশীদার হয়নি, তার সমবেদনায় কি ফেলে নি কোন নীরব দীর্ঘশ্বাস?

এলিয়ট-কথিত মহৎ কবিতার স্বতঃসঞ্চারী-ক্ষমতার মতো, চলচ্চিত্রের দৃশ্য বা দৃশ্যক্রমের সার্থকতা ও মহত্ত্ব-বিচারের কষ্টিপাথরও 'কমিউনিকেটিভনেস'-এই নিহিত চলচ্চিত্রে দৃশ্যের সহযোগী রূপে দেখা দেয় শব্দ, দৃশ্য ও শব্দের সহযোগে চলচ্চিত্র সমধিক হৃদয়-বেদ্যতা-সম্ভব। দৃশ্য ও শব্দের একক বা যৌগপাতিক অনুষঙ্গ সেখানে পরিচালককে অনেকখানি সহায়তা করে। পূর্বোক্ত ভাটিয়ালী গানটির দৃশ্য-শব্দ-অনুষঙ্গের সার্থক প্রয়োগ মাইকেল কার্টিজের 'দি ব্রেকিং পয়েন্ট' ছবির সেলাই-কল চালানোর দৃশ্য-শব্দ-অনুষঙ্গের তুলনীয় চমৎকারিত্ব মনে করিয়ে দেয়।

প্রয়োগ-কারুতার বিচারে আলোচ্য গানটিই শুধু নয়, আরও অনেক উল্লেখ্য উদাহরণ 'অপুর সংসারে' বর্তমান। পূর্বোল্লিখিত ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে অপর্ণার চোখে নতুন পৃথিবীর উদ্ভাসনা, বা সাহসী ফাঁকা শাদা ফ্রেমে ইঞ্জিনের ধোঁয়ার ক্রমস্ফুট আভাস ছাড়াও কম্পোজিশনের নৈপুণ্য ও সৌকুমার্যের প্রমাণ পাওয়া যায় রেল-ইয়ার্ডের দ্যুতি-ছায়ার মিলন-ভূমিতে অপু-পুলুর কথোপকথন দৃশ্যক্রমে, অপর্ণার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর নৈশ নিস্তব্ধতা-নিলীন বিষণ্ণ বিয়ে-বাড়ির দৃশ্যে, ছবির শেষ দিকের কয়েকটি মনোহর নিসর্গ-দৃশ্যে—বিশেষত সেই দৃশ্যে যেখানে বিবাগী অপু তার অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি উড়িয়ে দিয়ে নিজেকে স্মৃতিভার-মুক্ত করে। অপু-অপর্ণার দাম্পত্য-জীবনের কয়েকটি নিরলংকার দৃশ্যও চিত্তস্পর্শী কম্পোজিশনের দৃষ্টান্তরূপে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সর্বোপরি সাবজেক্ট মুভমেণ্ট ও ক্যামেরা মুভমেণ্টের (চলচ্চিত্র-শিল্পের যা প্রাণ) সার্থক মেল-বন্ধন ঘটায় কাহিনীগত সাবলীলতা আদ্যন্ত বজায় থেকেছে।

কম্পোজিশন এবং সেই সঙ্গে দৃশ্যক্রম-পরিবর্তনের নৈপুণ্যের নিদর্শনরূপে স্মরণে আসে অপু ও অপর্ণার ছবি দেখা ও সিনেমা-ফেরত ফিটন গাড়ির দৃশ্যক্রম। যে ছবি তারা দেখে সেই ছবির ফ্রেম ক্রমে ফিটনের ব্যাকগ্লাসের ফ্রেমে মিশে যায়। এই মিশে যাওয়া—চলচ্চিত্রের ভাষায় যার ইংরেজি নাম 'মিক্সিং', তার একটি মনোজ্ঞ দৃষ্টান্তরূপে—স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'মিক্সিং'

ছাড়া মণ্টাজের ক্ষেত্রেও শিল্প-প্রকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়; মেয়ের অকাল মৃত্যুতে দুঃসহ শোকে অভিভূত অপর্ণার মায়ের কান্নায় ভেঙে পড়া পরবর্তী দৃশ্যে সমুদ্রের অজস্র উত্তাল ঢেউয়ের তীরভূমিতে ভেঙে পড়ার প্রতীকে হৃদয়দ্রাবীভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই ধরনের পোয়েটিক মণ্টাজও বাংলা ছবিতে বিরলদর্শন।

বলা বাহুল্য, এবংবিধ প্রয়োগরীতিগত দক্ষতা সত্যজিৎ রায়ের চিত্রে স্বভাবী ঘটনা, কারণ তিনি চিত্র-ভাষার নিঃসন্দিগ্ধ অধীশ্বর। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর অনুসারীদের জন্য, আর-একটি প্রাসঙ্গিক-উল্লেখ্য ঘটনা এই যে, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে শিল্প-সিদ্ধি বা আঙ্গিক-নৈপুণ্যের নিদর্শনগুলি সমগ্র ছবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। সম্মিল কবিতার বা গানের স্বয়ং-সিদ্ধ মিলের মতো তারা অনিবার্যভাবে এসে থাকে, দৃশ্য-শব্দগত কোন কারুতাকেই কৃত্রিম বা সোচ্চার মনে হয় না। অর্থাৎ সেগুলি হয়ে-ওঠা পদার্থ বলে মনে হয়, বানিয়ে-তোলা জিনিস বলে ঠেকে না।

ভাষান্তরে অকৃত্রিমতা বা স্বাভাবিকতা সত্যজিৎ রায়ের চিত্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যপন্ন সম্পদ বলে তাঁর নির্বাচিত শিল্পীরাও কেউ অভিনয় করেন না, চরিত্রানুযায়ী সাভিব্যক্তি কথা বলেন। তাঁর ছবির অধিকাংশ শিল্পীই সে-কারণে নতুন, আক্ষরিক অর্থেই নতুন, এবং প্রবীণ যাঁরা তাঁরাও নতুন হয়ে দেখা দেন। আপাত-তুচ্ছ ভূমিকায় যাঁরা অবতীর্ণ হন, তাঁরাও স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে, দর্শক-স্মৃতিতে আসন অধিকার করেন, যার প্রমাণ, বাড়িওয়ালা, পাশা খেলায় ব্যস্ত প্রাইমারী স্কুলের বিচিত্র চরিত্রের কর্তা-ব্যক্তিটি, ওষুধের কার-খানার ম্যানেজার, অপুর অফিসের সহকর্মী,ময় ট্রামের সেই বিশিষ্টদর্শন লোকটি, যাকে দেখে সংকুচিত অপু অপর্ণার প্রিয় চিঠিটি পকেটে লুকিয়েছিল। অপুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পুলুর (প্রণবের) ভূমিকায় অবতীর্ণ স্বপন মুখোপাধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও প্রাণস্পর্শী অভিনয় একাধিক ছবির অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ যে-কোন পার্শ্ব-চরিত্রাভিনেতার ঈর্ষাযোগ্য। অপু ও অপর্ণার চরিত্র রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। সৌমিত্রর অভিনয়ে বুদ্ধি ও বোধির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে; দ্বিধাদোদুল স্বপ্নবিলাসী এবং সেই সঙ্গে জীবন-সংগ্রামী অপু তাঁর অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অপর্ণার ভূমিকায় শর্মিলার অভিনয়ও সমান প্রশংসাযোগ্য; শর্মিলার স্বল্প সংক্ষিপ্ত সংলাপের হার্দ্য উচ্চারণে নম্রস্বভাব অপর্ণার চরিত্র যেমন কবিতার মতো মূর্ত, তেমনি তাঁর তন্বী লাবণ্য বিভূতিভূষণের অপর্ণাকে বাস্তব-সম্ভব করে তুলেছে। চলন-বলনের বৈশিষ্ট্যে অপুর পত্নি কাজলের ভূমিকায় অলোক চক্রবর্তী মমতা দাবি করে। অন্যান্য ভূমিকায় শেফালিকা, বেলারাণী, ধীরেন ঘোষ, ধীরেশ মজুমদার প্রমুখের অভিনয় প্রশংসার্হ।

আবহসংগীত রচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা, সম্পাদনা ও শব্দগ্রহণে যথাক্রমে রবিশংকর, সুব্রত মিত্র, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, দুলাল দত্ত ও দুর্গাদাস মিত্র তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

মোটের উপর 'অপুর সংসার' একটি তারকাচিহ্নিত সর্বভারতীয় চিত্রসৃষ্টি তো বটেই, বৈশ্বিকভাবেও সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র। দোষ-ত্রুটি যে এতে নেই এমন কথা বলব না, এবং ছিদ্রান্বেষী চোখে পৃথিবীর মহত্তম শিল্প-সৃষ্টিও ত্রুটিযুক্ত, কিন্তু সব দোষ-ত্রুটি নিয়েও আলোচ্য চিত্র নিঃসন্দেহেই একটি সুচির-স্মরণযোগ্য চলচ্চিত্র-কীর্তি। চলচ্চিত্র যদি কবি-মনের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে 'অপুর সংসার' সেলু-লয়েডে প্রমূর্ত চিত্রল গীতিকাব্য এবং এর স্রষ্টা বোম্বাই-টকিজডের সমস্ত অপরাধের ক্ষতিপূরণ, নামত চিত্র-পরিচালক হলেও তাঁর স্থান স্রষ্টার মণ্ডলে।

বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ার দিকে 'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে আমি ঐ ছবিটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের উল্লেখ করে বলেছি, 'পথের পাঁচালী' অনেক নবীন প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন ও শক্তিমান চলচ্চিত্রীর সম্ভাবনাকে মুক্তি দিয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বে ও প্রচেষ্টার আন্তরিকতায় এই নবীন চলচ্চিত্রকারদের সম্পর্কে সুধীজনের কৌতূহলী প্রত্যাশা বিদ্যমান। এবং প্রত্যুত, তাঁদের কর্মকৃতিতে সে প্রত্যাশা বহুলাংশে পূর্ণ হয়েছে।

'অগ্রগামী' তরুণ বাংলার চলচ্চিত্রজগতের একটি বিশিষ্ট নাম। সর্বশেষ দুটি চিত্রকৃতির মাধ্যমে এঁরা সুধীজনের প্রত্যাশা জাগিয়েছেন, বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছেন। কর্মজীবনের প্রারম্ভে বস্ত্র-অফিসের দিকে চোখ রেখে, জনপ্রিয়তার সড়ক ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সুখের বিষয় অচিরেই তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে মত ও পথ পরিবর্তন করেন, সার্থকনামা হবার জন্য নতুন ধারায় নতুন ধরনের চলচ্চিত্র-নির্মাণে মনোযোগী হলেন।

'অগ্রগামী'র সর্বশেষ ছবির নাম 'হেডমাস্টার'। নরেন্দ্র-নাথ মিত্রের সুপরিচিত গল্প এই ছবির উপজীব্য। কুসুমপুর এম. ই. স্কুলের হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন সান্যাল স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জীবিকার সন্ধানে সপরিবারে কলকাতায় আসেন। অনেক চেষ্টা অনেক কষ্টের পর অবশেষে পুরানো ছাত্র নিরুপম দত্তের সহায়তায় ব্যাঙ্কে চাকরী পান কিন্তু নিজের আদর্শচরিত্র ও স্পষ্টভাষণের জন্য চাকরী হারান। জীবিকাচ্যুত নিঃসহায় অন্ধকারের মধ্যে কৃষ্ণদাসের মিলিয়ে যাওয়ায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

নাটকীয়তা-বর্জিত সাধারণ সরলরেখ গল্প। হৃদয়-বেদ্যতার গুণে প্রোজ্জ্বল হলেও জনপ্রিয় হবার উপাদান এতে কম, এবং চলচ্চিত্রের জন্য এই ধরনের একটি সরলরেখ গল্প নির্বাচন করে ও তথাকথিত জনপ্রিয় নট-নটীর সংস্পর্শ এড়িয়ে সেই গল্প চিত্রায়িত করে অগ্রগামী গোষ্ঠী যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাঁদের প্রশংসা না করে উপায় নেই। উপরন্তু বস্ত্র-অফিসের মুখ চেয়ে যে তাঁরা সেই ছোটগল্পকে বিকৃত করেন নি, এ জন্যে—এই সাধুতার জন্যে—তাঁরা সৎ চলচ্চিত্র-ভোক্তার ধন্যবাদভাজন। 'হেডমাস্টার' চিত্রে যে বিরলদর্শন সংযম, পরিমিতিবোধ ও বাস্তবানুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে নিঃসন্দেহেই 'অগ্রগামী'-গোষ্ঠী তরুণ বাংলার চলচ্চিত্রজগতে সম্মানিত আসন পাবেন।

অন্যান্য নবীন পরিচালকদের মতো 'অগ্রগামী'ও প্রায়-নবাগত; এখনো তাঁরা পরীক্ষা-লগ্নের চলচ্চিত্রী, সিদ্ধির সামীপ্য এখনো তাঁরা পাননি। শিল্পধর্ম থেকে বিচ্যুত না হলে সিদ্ধিলাভ তাঁদের পক্ষে অসম্ভব বা দূরবর্তী কোন ঘটনা হবে না। 'হেডমাস্টার' এবং তৎ-পূর্ববর্তী 'ডাকহরকরা' চিত্রে যে আন্তরিকতা ও স্বধর্ম-নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি, তা থেকেই এ-কথা আমার মনে হয়েছে।

ডি-সিকা একবার বলেছিলেন, আর্টিস্টের পক্ষে দেখাটা (দেখার চোখে) অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁর মতে, যেখানে অধিকাংশ লোক অন্যের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ভয়ে দেখতে চান না, সেখানে তাঁরা (অর্থাৎ চলচ্চিত্রকাররা) সর্বদাই চোখ খোলা রাখার অভিলাষী। এই দেখার চোখ খোলা রেখেছেন বলে অগ্রগামী গল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যামেরার ব্যবহার করে হেড-মাস্টারের বন্ধুর জীবনকে বিশ্বাসাভাবে পর্দায় উপস্থিত করেছেন। এবং গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ও গভীর মাধুর্যে ও তাৎপর্যে বিমণ্ডিত করেছেন।

বর্তমান ছবির গোড়াতেই হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্নবাবুর করুণধূসর মনের অবশ্য হৃদয়স্পর্শীভাবে ফুটে উঠেছে স্কুলের শূন্য ঘরগুলি বন্ধ করার দৃশ্যে। ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে স্কুলের ক্রমাবনতি, স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া ও সেই সঙ্গে শিক্ষণপ্রাণ হেডমাস্টারের মনোবেদনা রূপায়ণে পরিচালক-গোষ্ঠীর বিন্যাস-নৈপুণ্য, একটু অন্যভাবে দুর্গতি-ছায়া ও শব্দের সাহায্যে কাহিনী-বর্ণনাক্ষমতা, এবং চিত্র-ভূগোল-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর কলকাতায় জীবিকান্বেষণে কৃষ্ণপ্রসন্নের প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও জীবিকাহীনতা-জনিত মর্মপীড়া কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা-দৃশ্যক্রম এবং মাঝে-মধ্যে জন-বহুল কর্মব্যস্ত নাগরিক রাজপথ ও রাজপথে অসংখ্য পথিকের দ্রুত পদসঞ্চারের দৃশ্যের সমবায়ে 'কাট' পদ্ধতির সার্থক ব্যবহারে রুচি-সংযত ও চিত্র-সংগত-ভাবে রূপায়িত হয়েছে। এখানে বলা দরকার, অপ্রয়োজনীয় সংলাপে দুর্ভার নয় 'হেড মাস্টার', ব্যঞ্জনাগর্ভ ও অর্থবহ দৃশ্যের পারস্পরিক বিন্যাসে ও যথার্থ সংলাপে একদিকে যেমন মূল গল্পের সংহতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমতার যাথার্থ্য ও সার্থকতা সপ্রমাণ হয়েছে। 'হেডমাস্টার' দেখে বোঝা গেছে, 'অগ্রগামী'-গোষ্ঠী উল্লেখ্যরকমে চিত্রভাষা আয়ত্ত করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে সার্থক চলচ্চিত্রের প্রত্যাশা তাই স্বাভাবিক। চিত্রভাষার বিচারে, বর্তমান ছবি পূর্ববর্তী 'ডাকহরকরার' চেয়ে অপেক্ষাকৃত পরিণত ও ত্রুটিমুক্ত। সামগ্রিকভাবে, 'হেডমাস্টার'-এ নানাবিধ দোষ-ত্রুটি দেখানো যায়, কিন্তু সে-সব দোষ-ত্রুটি নিয়েও

নবীন চলচ্চিত্রী-গোষ্ঠীর এই সাম্প্রতিক চিত্রোপহার বাস্তবানুগ, পরিচ্ছন্ন ও সুশ্লীল, চলতি চিত্রধারার সুখী ব্যতিক্রমরূপে অভিনন্দনযোগ্য।

পরিচালক-গোষ্ঠীর সঙ্গে অভিনন্দনযোগ্য চিত্রকর্মী আলোকচিত্রী রামানন্দ সেনগুপ্ত ও সংগীতপরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা কারুপ্রকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির পরিবেশ রচনায় তাঁদের কৃতিত্ব প্রশংসার্হ। ছবিতে গান আছে একটি, লিখেছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা ছবিতে সাহিত্যিক রচিত গীতিযোজনার এই সুদুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যও পরিচালকদের প্রশংসা করতে হয়), তবে এই গানটি না থাকলে ক্ষতি ছিল না, কারণ কাহিনীর সঙ্গে তা অপরিহার্যভাবে সংলগ্ন হয়নি।

কিন্তু 'হেডমাস্টার' ছবির প্রকৃত অভিনন্দনযোগ্য অংশ সম্মিলিত অভিনয়ের তৃপ্তিকর নৈপুণ্য। যে সময় বাংলা ছবি দু'চারজন জনপ্রিয় নট-নটীর কৃপাকণার উপর নির্ভরশীল, সেই সময় তাঁদের পরিহার করে 'অগ্রগামী' নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ সাহস ও শিল্প-লগ্নতার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণপ্রসন্নের স্ত্রী লাবণ্যের চরিত্রে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় অভাব-পীড়িত নিম্ন মধ্য-বিত্ত বাঙালী বধূর চরিত্র স্বভাবী যাথাযথ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কৃষ্ণপ্রসন্নের অনূঢ়া কন্যা গীতার চরিত্রে নবা-গত রঞ্জনা স্বল্পবাক ও অভিব্যক্ত অভিনয়ে দর্শক-স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী দাগ কাটেন। কৃষ্ণপ্রসন্নের কৃতী ও প্রিয় ছাত্র নিরুপমের ভূমিকায় নবাগত শ্যামল ঘোষালের অভিনয় চলনসই পর্যায়ের, কিন্তু ছবির শেষাংশে কৃষ্ণ-প্রসন্নকে বরখাস্তের নোটিশ দেওয়ার নাটকীয় মুহূর্তের সদ্ব্যবহার তিনি করতে পারেন নি, পারলে 'হেড মাস্টার' ছবিটি আরও তৃপ্তিকর রকমের অন্তঃস্পর্শী হতো।

অন্যান্য ভূমিকায় শোভা সেন, শিশির বটব্যাল ও গঙ্গাপদ বসু চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন।

সম্মান-স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদেই আলোচনার যোগ্য বলে যাঁর অভিনয়ের কথা এতক্ষণ বলিনি, সেই ছবি বিশ্বাস 'হেডমাস্টার' ছবিতে সুচির স্মরণযোগ্য অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয় এ ছবির প্রাণ-সম্পদ। আদর্শ শিক্ষক অন্যায়ের বিরুদ্ধে একক প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তোলায় সত্য-ও-স্পষ্টভাষী কৃষ্ণপ্রসন্নের পদে পদে বিড়ম্বনা, মর্মপীড়া ও পরিশেষে জীবিকা-বিচ্যুতির দুর্ভার দুঃখ ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ে মেঘলা দিনের বিষণ্ণতায় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কি করি বলো তো', এই সংলাপটুকুর উচ্চারণে যে দারুণ হতাশা ও অসীম অসহায়তা ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি, তা সহজে ভোলা যায় না। ছবি বিশ্বাস যে নিঃসংশয়েই বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা 'হেড-মাস্টার' দেখে তা আরেকবার মনে হলো। শেষ-সম্বল-চাকরীটি হারিয়ে অনাত্মীয় শহরের নিষ্প্রাণ রাজপথের বিস্তীর্ণ বেদনায় ঠিকানা-হারা যাত্রীর মতো যেভাবে কৃষ্ণপ্রসন্নরূপী ছবি বিশ্বাস বেরিয়ে পড়েন ছবির অন্তিম দৃশ্যে, তাতে চোখের জল বাধা মানে না, নির্ধারিত বৃষ্টির তীব্রতাতেই তা যেন বেরিয়ে আসতে চায় চোখের কোণ বেয়ে।

আশ্চর্য, ছবি দেখে প্রেক্ষাকক্ষের বাইরে এসে দেখি, বৃষ্টির উচ্ছ্বাস তখনো থামেনি।

অপুর সংসার। সত্যজিৎ রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত। ছায়াবাণী পরিবেশিত।

হেডমাস্টার। অগ্রগামী পরিচালিত। রীতেন অ্যান্ড কোং প্রযোজিত। নারায়ণ পিকচার্স পরিবেশিত।

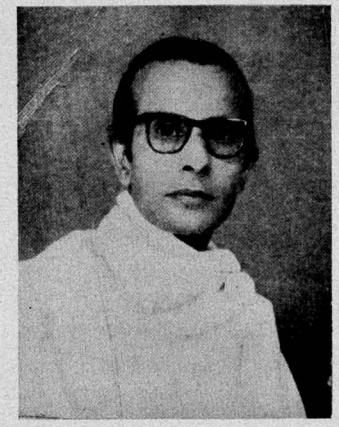

শিল্পী হেমন্ত মিশ্র

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

এই প্রবন্ধে চিত্রকলায় তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকট। এ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়।

আট বছর আগে যখন হেমন্ত মিশ্রের প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী হয় তখনই তিনি কোলকাতার কলারসিকদের মনে বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি কোরতে পেরে-ছিলেন। সেদিন তাঁর রচনায় শিল্পীর চরিত্রের কতক-গুলি মৌলিক গুণের লক্ষণ ধরা দিয়েছিলো। যেমন, শিল্পপ্রেরণার দিক থেকে তাঁর রচনা ছিলো একান্ত-ভাবেই আন্তরিক; অর্থাৎ, দর্শককে চমকে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি তুলি ধরেন নি। মনের দিক থেকেও তিনি পল্লবগ্রাহী নন—চিত্রজগতের হালফিল ফ্যাশনের বুদ্বুদ তাঁর ছবির পটে আশ্রয় নেয় নি। তাঁর শিল্পদৃষ্টি, বক্তব্য ও রূপারোপের মধ্যে এক গভীর সততা আর সরলতা ছিলো, যে কারণে তাঁর ছবি দর্শককে দূরে ঠেলে দেয় নি—দর্শক তাঁর ছবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাঁর চরিত্রের আর-একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি মুখর শিল্পী নন। নীরবে, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে, তিনি কাজ কোরে যান।

তাঁর রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্বল্প। তার একটি কারণ, শিল্পী মিশ্রের বাসভূমি হলো আসাম। তাঁর শিক্ষা, শিল্পীজীবনের শুরু এবং প্রাথমিক শিল্প-চর্চা সেখানেই ঘটেছে। কোলকাতায় প্রথম প্রদর্শনী বসা-বার আগে পর্যন্ত আসামের জলবায়ুই তাঁর শিল্পী-মনের রসদ জুগিয়েছে। তারপর তাঁকে কোলকাতায় আসতে হয়েছে বৃহত্তর শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে। কোলকাতার শিল্পজগৎ এই শিল্পীর আগমনে নিঃসংশয়েই সমৃদ্ধ হয়েছে।

১৯১৭ সালে শিবসাগরে শিল্পী হেমন্তকুমারের জন্ম। শিশুবয়স থেকেই ছবি আঁকার দিকে তাঁর যে আকর্ষণ দেখা দেয়, অন্তরের তাগিদে তা নিজেরই অনুসৃত পথে অগ্রসর হতে থাকে; স্বদেশ বা স্বসমাজের

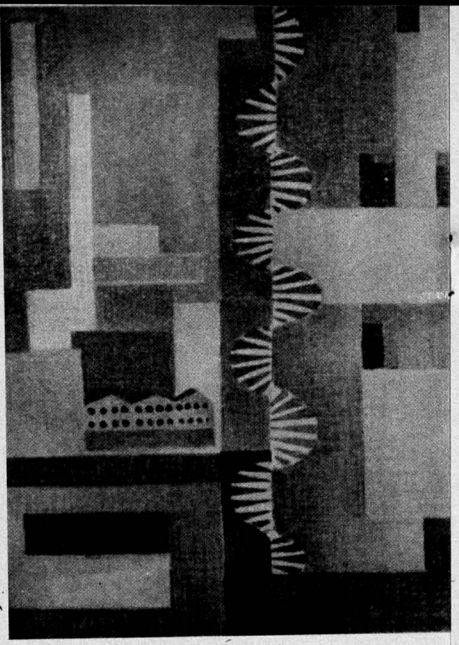

শিল্পী হেমন্ত মিশ্রর 'দুরন্ত সিঁড়ি' তাঁর নব রূপ-সৃষ্টির একটি নমুনা।

কোনো পরিবেশই সেই প্রেরণাকে নির্দিষ্ট পথে চলতে সাহায্য করে নি। আন্তরিক তাগিদে নিজের খেয়াল-খুশিমতো ছবি লিখে তাঁর সৃষ্টির উৎসাহ নিবৃত্ত হতো। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর তিনি গৌহাটি কটন কলেজে ও শিলং সেন্ট এডমন্ডস কলেজে পড়াশোনা করেন। এরই মধ্যে তিনি বিলাতের জন হ্যাসাল করেসপন্ডেন্স আর্ট স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের কাছ থেকে শিল্পচর্চার একটা সুসম্বদ্ধ পাঠ গ্রহণ করেন।

কোলকাতায় প্রথম প্রদর্শনীর দীর্ঘ আট বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে কিছুদিন আগে। এই আত্মগোপন তাঁর শিল্পচর্চা থেকে বিরতি নয়—ইতিমধ্যে তা চলেছে, অবিচ্ছেদ নিষ্ঠায়। অবশ্য স্বভাবগত একটা লাজুকতা তাঁকে বাধা দিয়েছে আর্টের পৌষমেলায় তাঁর শিল্প পাঠাতে। সুতরাং, দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে শিল্পীর যে দৃষ্টিগত ও মানসিক রূপান্তর সুস্পষ্ট, তা কোনোক্রমেই আকস্মিক নয়, তার অন্তরালে এই সুদীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি রয়েছে। এই রূপান্তর শিল্পীর শিল্পচেতনার মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকপরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে, যার সঙ্গে শিল্পীর প্রথম দিকের শিল্পকার্যের সেতুবন্ধন এক রকম অসম্ভব বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তনের হেতু নির্ণয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে আসাম ও কোলকাতার আবহাওয়ার পার্থক্য যে শিল্পীর শিল্পচেতনার রূপান্তরে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা স্বীকার করতে হবে। প্রথম দিকে আসামের উদার উজ্জ্বল প্রকৃতি ও জীবন একটা সহজ চিত্রময় আবেদন নিয়ে শিল্পীকে আকর্ষণ করেছে। তাই চিত্রপটে উদ্ভাসিত হয়েছে আসামের আকাশ, উপত্যকা, দুরন্ত নদী, পাহাড়ের শ্রেণী তাদের বিচিত্র বর্ণসমারোহে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক রোমান্টিকতা তিনি অতি সফলভাবে দর্শকের মনেও সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন। অবশ্য শিল্পীর প্রাথমিক শিল্পপাঠ ইউরোপীয় অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে হওয়ার দরুন অনিবার্যরূপে ইমপ্রেশনিস্ট রীতিই তাঁর শিল্পপ্রকাশের মাধ্যম হয়েছে। এই উজ্জ্বল প্রকৃতির অপরিমেয় বর্ণসম্ভারের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করতে হলে ইমপ্রেশনিস্ট রীতিই যে সবচেয়ে উপযোগী, তা না মেনে উপায় নেই।

তবুও শিল্পীর সাম্প্রতিক রচনাগুলি দেখবার পর মনে হয়েছে, ভাবাবেগপ্রাধান্যই তাঁর প্রথম যুগের রচনার মূল আকর্ষণ। প্রকৃতির দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ শিল্পীর মনে যে মোহ বিস্তার করেছে, সেই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের একটা সামগ্রিক বিশ্বস্ত রূপ তিনি ছবির মধ্যে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ যুগের ছবির মধ্যে সহজ ভাবালুতা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সেইখানে এসেছে একটা আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ়, বুদ্ধিপ্রধান শিল্প-চেতনা—যা বস্তুর বাইরের রূপের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে। সেইখানে দেখা দিয়েছে বস্তুর মৌলিক গঠনের রহস্য জানার স্পৃহা; সেখানে এসেছে শিল্পীর নিজস্ব শিল্প-অনুভব সম্বন্ধে বক্তব্য এবং বস্তুরূপকে একটা গঠনগত সৌকর্যের মধ্যে চিত্ররূপ দেওয়া। সুতরাং নিছক ভাবময়তা থেকে একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী চেতনায় উত্তরণই তাঁর এ যুগের শিল্প-কলার মুখ্যলক্ষণ বলা যেতে পারে। ফলে যে চিত্রশৈলীর উদ্ভব ঘটেছে তা একান্তভাবে শিল্পব্যঞ্জনার প্রয়োজনেই এসেছে। অনেকে এই চিত্রশৈলীর মধ্যে অমূর্ত শিল্পের প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু একটা কথা প্রথমেই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে বিষয়নিরপেক্ষতাই অমূর্ত শিল্পের মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ অমূর্তবাদী শিল্পীরা বিষয়ের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে বস্তুর মূলগঠন, রূপনির্মাণ, পারস্পরিক ভারসাম্য ও সংযোজনের মধ্যেই শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা বলে

শিল্পী হেমন্ত মিশ্র অঙ্কিত 'দুর্ধর্ষ সিং-এর দুরন্ত গতি' একটি সুনিশ্চিত চিত্রকর্ম।

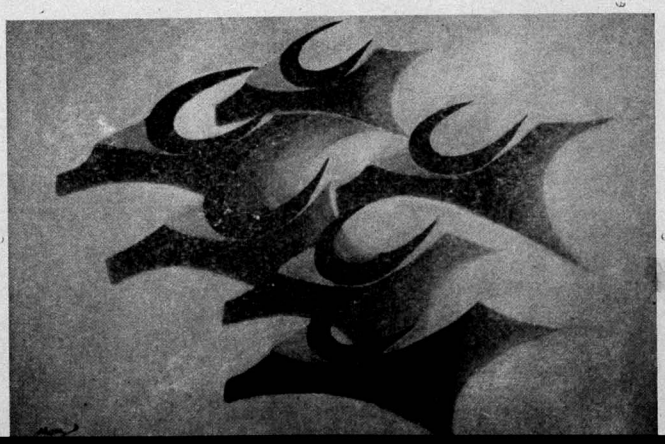

শিল্পী হেমন্ত মিশ্রর বনানীর মধ্যে অবস্থিত স্নিগ্ধ কুটিরের এই মনোরম চিত্রটি যদিও তির্যকভঙ্গি আশ্রিত, তাহলেও শ্যামায়মান স্নেহের শ্যামলতায় পারিপার্শ্বিক পরিপূর্ণ করতে তিনি নিতান্তই সক্ষম।

স্বীকার কোরে থাকেন। কিন্তু শিল্পী হেমন্তকুমার কোথাও বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেন নি। বিষয়কে স্বীকার করে নিয়েই তিনি গঠনসৃষ্টির দিকে অগ্রসর হয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক ছবিতেই শিল্পীর নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে, এবং সেই অনুযায়ী তিনি বস্তুকে পরিমার্জিত, পরিবর্তিত করেছেন। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা প্রচ্ছন্ন রূপকের অথবা প্রতীকী রূপের ইঙ্গিত এসেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি 'ফোর আর্টস্' ছবিটির উল্লেখ করতে পারি। সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা—এই চারটি শিল্পের সম্মিলিত ব্যঞ্জনা হিসেবে এই ছবিটি রূপলাভ করেছে। এক-একটি শিল্প যার আশ্রয়ে প্রধানত ব্যঞ্জনা লাভ করে, শিল্পী প্রধানত সেইগুলির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন নৃত্যকলায় পা, ভাস্কর্যে বাটালি ও হাতুড়ি, সুরসৃষ্টিতে আঙুল, ও চিত্রকলায় তুলি, এই চারটি সামগ্রিক ভাবকল্পনার প্রতীক হয়ে রূপলাভ করেছে। 'ডিফারেন্ট ফেদার্স' এই রচনাটির দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। তিনটি পাখির যে রূপ ও ভাবগত পার্থক্য আমাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে—শিল্পী তাকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করেন নি। বিষয়কে স্বীকার করে নিয়েই শিল্পী যে গাঠনিক সুষমার সৃষ্টি করেছেন, সেই রূপরচনাই বিষয়কে পশ্চাদ্‌বর্তী করেছে।

বস্তুত হেমন্তকুমারের সাম্প্রতিক রচনাগুলিতে বিষয় ও গঠনসৃষ্টির আশ্চর্য সমীকরণ ঘটেছে। অথচ এই নতুন গঠনসৃষ্টির প্রয়াসে তাঁকে কোথাও প্রভাবাশ্রয়ী বোলে মনে হয় না। বরঞ্চ কোথাও যেন একটা স্বাদেশিক নৈকট্য অনুভব করা যায়। তাঁর নব্য

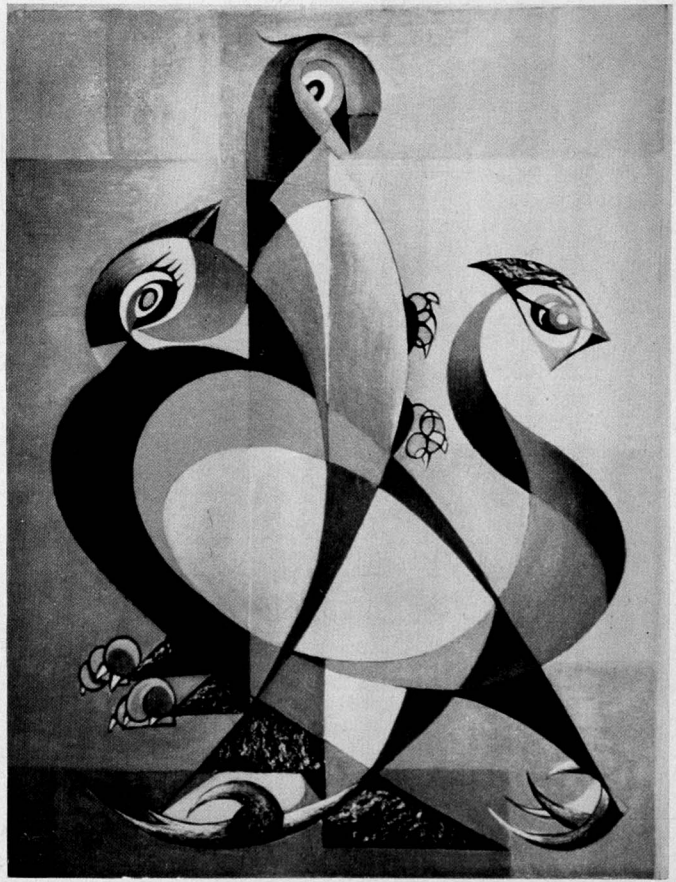

শিল্পী হেমন্ত মিশ্র
অঙ্কিত একটি অভিনব চিত্র
'বিভিন্ন পালকের সমাবেশ'।

প্রথম যুগে অঙ্কিত শিল্পী হেমন্ত মিশ্রর একটি নিসর্গচিত্র।

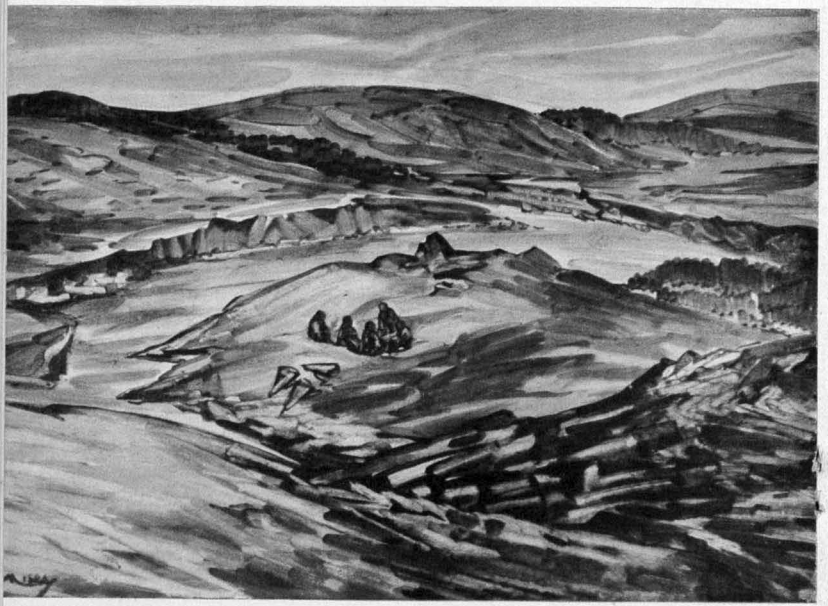

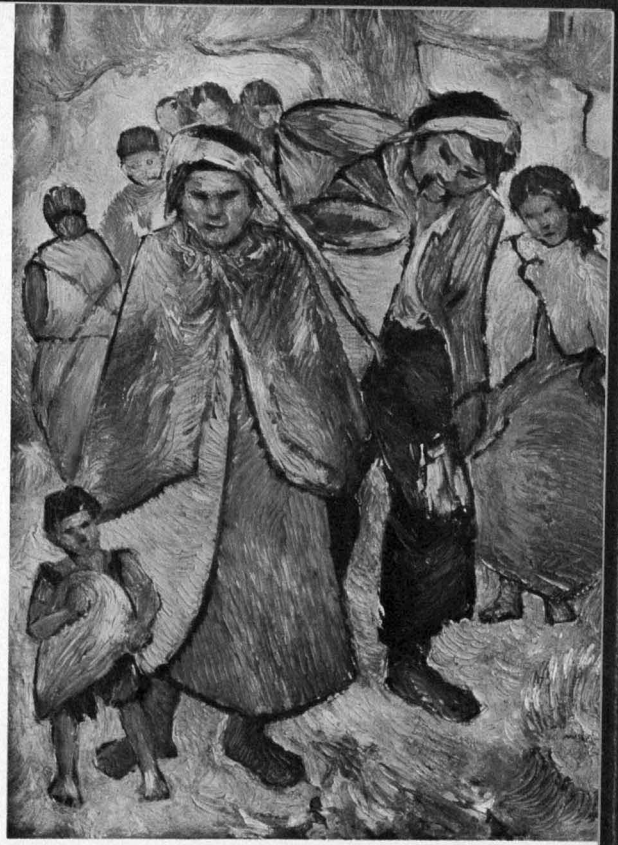

শিল্পী হেমন্ত মিশ্রর প্রথম যুগে
অঙ্কিত একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

প্রথম যুগে অঙ্কিত শিল্পী হেমন্ত মিশ্রর একটি নিসর্গচিত্র।

শিল্পী হেমন্ত মিশ্রর প্রথম যুগে
অঙ্কিত একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

পর্যায়ের শিল্পকলার ঝোঁক প্রধানত লিনিয়ার হবার দিকে, পার্সপেকটিভ সৃষ্টির প্রয়াস অনেকাংশে ভারতীয় রীতিতে এবং কিছুটা অলংকরণপ্রবণতা তাঁকে ভারতীয় শিল্পপথিকের মর্যাদা দিয়েছে। তারপর বর্ণব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করলে, তাঁর ছবির নিছক ভারতীয় সুর আরো স্পষ্ট হবে। তেলরঙ তাঁর শিল্পের মিডিয়ম, কিন্তু সময়ে সময়ে বর্ণব্যবহার টেম্পেরার আভাস দিয়েছে। তাঁর আধুনিক কালের প্রতিটি রচনাতে তিনি এমন এক শান্ত বর্ণবিস্তার করেছেন, যার স্নিগ্ধতা ও ব্যবহারের ধারা আমাদের ভারতীয় শিল্পে বর্ণব্যবহারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিলীয়মান বর্ণবিস্তার যখন আর একটি বর্ণে সঞ্চারিত হয়েছে, তখন টোনের সমধর্মিতাই চিত্রপটকে এক শান্তশ্রী দিয়েছে। কোথাও বিপরীত বর্ণের প্রয়োগে চিত্রপট উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি। এদিক থেকে বিচার করলে হেমন্তকুমারের সাম্প্রতিক শিল্পদৃষ্টি অনেকটা ভারতীয় রূপভাবনা ও অনুভবের কাছাকাছি। যদিও শিল্পীকে আধুনিক রূপপ্রকাশের সজ্ঞা সংগ্রহ করতে হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন হাট থেকে, তবু তাঁর অন্তরের ভাষা, তাঁর চারিত্রিক বিশেষত্ব নিঃসন্দেহেই উৎকৃষ্ট ভারতীয় শিল্পঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। এইজন্য তাঁর সাম্প্রতিক রচনা আধুনিকতার আবরণ গ্রহণ করলেও তা আমাদের বিচলিত ও বিভ্রান্ত করে না, দৃষ্টিকে সংকুচিত কোরে তাঁর রচনা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না। বরং কোথায় যেন আত্মিক সম্পর্ক অনুভব কোরে আমরা উল্লসিত হয়ে উঠি।

অবশ্য আমি এ কথা মনে করি না যে শিল্পী তাঁর সাম্প্রতিক পরীক্ষানিরীক্ষায় একটা সিদ্ধির সীমায়

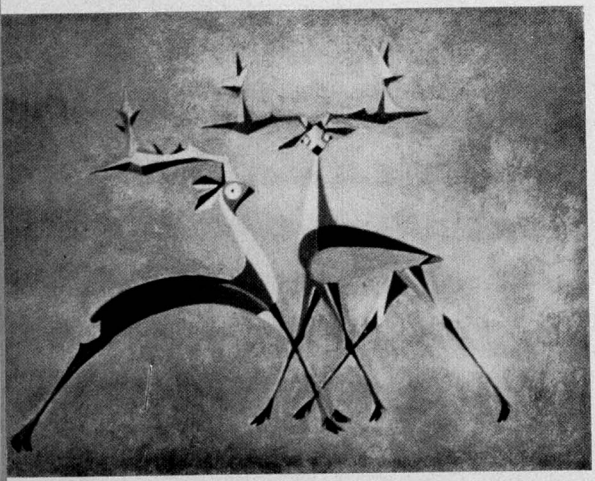

শিল্পী হেমন্ত মিশ্র
অঙ্কিত 'দুটি থমকে-থাকা হরিণ'-এর একটি অপূর্ব চিত্র।

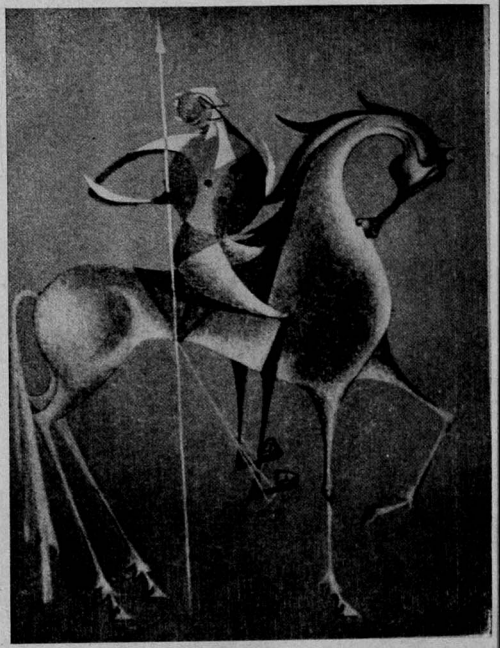

শিল্পী হেমন্ত মিশ্র
অঙ্কিত একটি প্রবীণ যোদ্ধার অতি বিচিত্র ছবি।

পৌঁছে গেছেন। তাঁর শিল্পীজীবনের এই পর্যায়টি দৃষ্টি ও ভাবনার এক গভীর ব্যাকুলতা ও এষণার কথাই প্রকাশ করছে। এই এষণাই প্রাণবন্ত শিল্পীর একমাত্র পরিচয়,—যা গতানুগতিতে তৃপ্ত নয়, যা নিজের সামান্য প্রকাশের মধ্যেই চরম চরিতার্থতার সন্ধান পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় নি, যা নতুনকে গ্রহণ করতে যেমন উদার, তেমনই নির্দয়ভাবে বাহুল্যকে বর্জন করবার শক্তি ধারণ করে। সার্থক শিল্পীচরিত্রের এই বিশেষত্বের পরিচয় হেমন্তকুমারের রচনায় আছে বলেই শিল্পী হিসেবে তাঁর উজ্জ্বলতর সাফল্যের প্রত্যাশা করা অনুচিত হবে না।

এই প্রবন্ধটি শিল্পী হেমন্ত মিশ্রর কোলকাতার পার্ক স্ট্রীটে অবস্থিত আর্টিস্ট হাউসে সম্প্রতি আয়োজিত একক চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত হোলো।

—সুন্দরম্ সম্পাদক।

শিল্পী হেমন্ত মিশ্র অঙ্কিত 'চতুষ্কলা' নামীয় একটি প্রতিক চিত্রের প্রতিলিপী।

বসন্তের ছবি

ফাল্গুনে ফুল ফুটে ওঠে বনে বনে
যেন রূপসীর ওষ্ঠের ফিকে লাল
যেন আকাশের নীল ওই নির্জনে
যত জলদের জমেছে ঊর্নাজাল

আশ্লেষে যেন বাতাসের বাহুপাশ
কদলীবৃক্ষ কুমারীর মাজা উরু
পাখিদের মনে উৎসাহী উচ্ছ্বাস
মিথুন-লগ্নে প্রেমালাপ সবে শুরু।

চুম্বনে জ্বলে চন্দন চক্‌মকি
ইন্দ্রিয়ে যেন ইন্দ্রের বাসা ভাড়া
স্মৃতি ভরে জাগে লিপ্সার নর্তকী
যেন মধুশালা গোটা প্রাকৃতিক পাড়া।

বসুধার সুধা পান করে মধুকরী
প্রজাপতি ওড়ে বিকীর্ণ করে জ্যোতি—
যদি এলে চোখে স্বর্ণিল বিভাবরী
কৌমার্যের হয় হোক কোনো ক্ষতি।

ফাঁকা বালুচরে নড়ে ওঠে রাঙা নুড়ি
তরঙ্গ যেন মসৃণ শাদা হাত,
উপমায় যেন বাজে বেলোয়ারি চুড়ি
রাঙা ছায়া যেন অলকে জল-প্রপাত।

ফাল্গুনে ফুল ফুল্‌কির মতো জ্বলে
জোনাকিরা রাতে চুম্‌কির মতো বোনা,
তারার ঘুঙুর চুপি চুপি বেজে চলে
বাসনারা করে তন্দ্রায় আনাগোনা।

সুনীল বসু

সুধীর চক্রবর্ত্তী
বর্তমানে কোলকাতার
একটি বিশিষ্ট
কলেজের অধ্যাপক।
সংগীতসাধনায়
এঁর গুরু—অধ্যাপক
গোবিন্দগোপাল
মুখোপাধ্যায়।

সংগীত-জিজ্ঞাসা ঃ শুদ্ধ সংগীত থেকে ভাষাগীত

Music is by no means like other arts, the copies of ideas, but the copy of the will itself ... that is why the effect of music is so much more powerful and penetrating than that of the other arts, for they speak only of shadows, but it speaks of the thing itself. শোপেনহওরের উপরোক্ত মন্তব্যে সংগীতের ধর্ম এবং অন্যান্য শিল্প-রূপের তুলনায় তার মৌলমহিমা সুব্যক্ত। বস্তুত সংগীতের সহজাত ভাবধর্ম এবং স্বয়ম্ভু আত্মপ্রকাশই তাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের গৌরব দিয়েছে। সেইজন্যই আধুনিক কালে যেকোন সংগীতজিজ্ঞাসায় শিল্পকলার আদি উদ্দেশ্যের কথা এবং তার পরিণতির প্রশ্ন এসে পড়ে। ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার ক'রে বলা যাক। পৃথিবীর যেকোন উন্নত পর্যায়ের সংগীতের দুটি ভাগ। শুদ্ধসংগীত বা ধ্রুবসংগীত এবং ভাষাগীত। প্রথমটি শুধু সুরময়। দ্বিতীয়টি কথা ও সুরের সম্মেলক এক বিচিত্র প্রকাশ। প্রথমটি সুরময় বলেই তা সুরূপে যন্ত্রসংগীতের অনন্য আশ্রয় এবং ভারতীয় ধ্রুবসংগীতের অবলম্বন। দ্বিতীয়টি সংগীতশিল্প হিসাবে উচ্চমার্গে স্থান না পেলেও জনসাধারণের সহৃদয় পক্ষপাতিত্ব পেয়ে থাকে। প্রথমটিকে বলি শুদ্ধ বা ধ্রুবসংগীত (Pure or Classical Music), দ্বিতীয়টিকে বলি ভাষাগীত (Vernacular Music)। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সংগীতজগতে উভয়েরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কিন্তু কথাহীন ধ্রুবসংগীতই শুদ্ধশিল্প এবং সংগীতশিল্পের চরম পরিণতিবাহী এমন মত প্রচারিত। কিন্তু আমরা দেখেছি, ভাষাগীতও অসাধারণ শিল্পকলা এবং রবীন্দ্রনাথের মত সংগীতবিদ্ এই ভাষাগীতেরই চর্চা ক'রে গেছেন; এমনকি সংগীত-ইতিহাসের এক পরাক্রান্ত উপাদান লোকসংগীতও বস্তুত ভাষাগীত।

ভাষাগীতের উপাদান দুটি : কথা এবং সুর। অর্থাৎ কবিতা এবং সুর। সেইজন্য এই অপূর্ব সমবায়ে যে শিল্পকলার সৃষ্টি তা জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী। আধুনিক পৃথিবীতে কবিতাও শুদ্ধশিল্প বলে স্বীকৃত এবং সেই কবিতার রসস্পর্শ ভাষাগীতে আছে বলেই তা চিত্রধর্মী, আবেগময় এবং সৌন্দর্যসম্পন্ন। উপরন্তু ধ্রুবসংগীত শুধু সুরময় ব'লে মনের কতকগুলি স্থায়ী ভাবকে রূপায়িত করে কিন্তু ভাষাগীত কবিতার সহায়ে মনের অনেক খণ্ডক্ষুদ্র অন্তর্লীন সূক্ষ্মতাকে রূপায়িত করে। কাজেই ভাষাগীত ধ্রুবসংগীতের অনিবার্য পরিণতি এবং প্রগতির সূচক এমন বলা যায়। কিন্তু ভাষাগীত ধ্রুবসংগীতের মত শুদ্ধতম শিল্প নয় এবং সম্পূর্ণ ভাবাত্মক (abstract) নয়। তাকে ভাষার সহায়তা নিতে হয় এবং তার থেকেই আসে প্রতীক ও রূপময়তা। আধুনিক পৃথিবীতে প্রত্যেক শিল্পে ভাবাত্মক সাধনারই অগ্রগতি। আর ভাষাগীতে যদিও আমাদের মনের অনেক সূক্ষ্ম অনুভব বাণীরূপ পায় তবু তা ভাবাত্মক নয়। সেইজন্য আধুনিক সংগীত-জিজ্ঞাসায় ধ্রুবসংগীত ও ভাষাসংগীতের উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্পর্কে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

সমস্যাটি গুরুতর। এবং তার সদুত্তরের আশায় আমাদের আলোচনা শুরু করতে হবে সংগীতশিল্পের উদ্ভব ও উদ্দেশ্য থেকে। কবে কোন্ দেশে প্রথম সংগীত রচনা হয়েছিল তা নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। সংগীতসৃজনের উদ্ভব-ইচ্ছা তখনই জাগে :

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতই
সুরসংঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গী দেয় তাকে,
নাচায় বিচিত্র আবর্তনে।
সেই সীমায়-বন্দী নাচন
পায় গানে-গড়া রূপ।

[শেষ সপ্তক। ১৭-সংখ্যক কবিতা]

রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতি থেকে এক পরম সত্য খুঁজে পাই। বুঝতে দেরি হয় না যে প্রকৃতপক্ষে সুরও মনের একটি ভাষা। ভাষার কাজ ভাবকে রূপ দেওয়া। সেই রূপসৃষ্টিতে যখন সুরের ভাষা লাগে তখন জন্ম নেয় ধ্রুবসংগীত, আর যখন অর্থবাহী কথার আভায় সুর-সমন্বয় ঘটে তখনই ভাষাগীতের সৃজনলগ্ন। উভয়ের মৌল উদ্দেশ্য একই, কেবল রূপের বিভিন্নতা। সেই বিভিন্নতায় মানুষের মনের ইতিহাস সুন্দরভাবে ব্যক্ত। যুগে যুগে ধ্রুবসংগীত এবং ভাষাগীত সমান্তরালভাবে চলেছে। তাতে মানুষেরই রসগ্রাহিতার শিলালিপি। কেননা মানুষের শিল্পপীমন শুদ্ধ স্বরগ্রামের লীলাচঞ্চল শান্ততায় মুগ্ধ হলেও সেই মন আবার রসসন্ধানী হয় লোকসংগীত বা ভাষাগীতের রূপময় আবেগে। মানুষ দুইই চায়। তার মন একই সঙ্গে শুদ্ধভাবময়তা এবং কথাযুক্ত রূপরসে সাড়া দেয়। শিল্পীও তেমনই উভয়ের প্রতি সনিষ্ঠ। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের মত সংগীতকার সুরচর্চা এবং কথা ও সুরের যুক্তবেণী উভয়তই সমান-উৎসাহী ছিলেন। তবুও প্রভেদ আছে। কোন কোন শিল্পী বা শিল্পরসিক গভীরভাবে হয় ধ্রুবসংগীত কিংবা ভাষাগীতে বিশ্বাসী। যাঁরা ধ্রুবসংগীতে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন ধ্রুবসংগীত শিল্প হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক, ভাবাত্মক এবং শাশ্বত। ভাষাগীতের প্রচারকরা মনে করেন, ভাষাগীত কাব্যরূপময়, যুগপ্রগতির লক্ষণাক্রান্ত এবং শিল্পীব্যক্তির স্নিগ্ধ স্পর্শে মধুর।

দেশ এবং জাতির হিসেবে দেখতে পাই, সমস্ত য়ুরোপে মূলতঃ ধ্রুবসংগীতের চর্চা যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে অসাধারণ বিকশিত; তার পাশে ভাষাগীত অপ্রধান এবং অকৃতার্থ। অথচ পাশাপাশি ইংলন্ডে যন্ত্রসংগীত তথা ধ্রুবসংগীতের চেয়ে ভাষাগীতের প্রতি পক্ষপাত। তার প্রধান প্রমাণ, শেকস্‌পীঅর, বায়রন এবং ইয়েট্‌স্‌-এর গানে। ইংলন্ডের এই ভাষাগীত-প্রবণতা আজকের নয়। সমালোচকের সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে : The English have always been singers rather than instrumentalists, and at all periods vocal music has been England's chief contribution to the art. [Shakespeare and Music : Edward J. Dent.] এই ভাষাগীতপ্রবণতাই বুঝিবা ইংলন্ড-আয়র্লন্ডের কবিকুলকে গীতাঞ্জলির প্রতি অনুরক্ত করেছিল। ভারতবর্ষে দক্ষিণঅঞ্চলে ধ্রুব-সংগীতের সুদৃঢ় বনিয়াদ; উত্তরভারতেও রাগসংগীতের অপ্রতিরোধ্য গতি। সমগ্রভাবে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে ভাষাগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ। অথচ বাংলাদেশে ভাষাগীতের প্রাবল্য কয়েক শতাব্দীব্যাপী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যাত্রা, পাঁচালি, কবিগান, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতিতে বাংলা ভাষাগীতের জয়চিহ্ন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমাজ এবং দেশস্বাতন্ত্র্যে ধ্রুব-সংগীত ও ভাষাগীতের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য।

অন্যান্য শিল্পের মত সংগীতেও আমরা আমাদের মনোভাব, বাসনা বা চিত্তবৃত্তিকে প্রকাশ করতে চাই। ভাষাগীতে এই প্রকাশের সহায়তা করে কথা। কথা বা বাণীর অর্থময়তা যুগে যুগে বদলায়। যেমন কবিতার ব্যঞ্জনা যুগে যুগে অভিনব। সেইজন্যই ভাষাগীতে যুগচিহ্ন, সমাজলক্ষণ এবং মানসিক প্রগতির বোধ খুব সহজে স্থান ক'রে নেয় কথার সাহায্যে। শুদ্ধসংগীতে এই সুযোগ নেই। সেক্ষনে স্বরবিস্তারের পারম্পর্য এবং গভীর ভাবাত্মকতায় ব্যক্তি, সমাজ এবং যুগের চিহ্ন প্রায় অদৃশ্য। অথচ একটি কীর্তনগানের ভাষাবয়নের মাধ্যমে আমরা ধর্মীয় উদ্বেলতা কত সহজে খুঁজে পাই। বাউল-গানের বিশ্বব্যাপী বৈরাগ্যব্যাকুলতা এবং ভাটিয়ালির করুণ অন্তর্বেদনা আমরা কথার মধ্যে দিয়ে প্রথমে অনুভব করি, সুরে তারই লীলায়িত প্রকাশ লক্ষ্য করি। বস্তুত ভাষাগীত ধ্রুবসংগীতের চেয়ে অনেক সহজে অনুভবযোগ্য, যুগস্বাক্ষরবাহী এবং ব্যক্তিমনের স্পর্শে স্নিগ্ধ। সেইজন্যই ভাষাগীত ধ্রুবসংগীতের চেয়ে প্রগতিসম্পন্ন এবং কৃতার্থ এমন মনে করা হয়। ভাষা-গীতের একজন সার্থক শিল্পী এবং প্রচারক রবীন্দ্র-নাথের কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি।

১ 'যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই; ঐখানে হাত-কড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নির্দ্দোষ্টি যাঁরা স্পর্ধাসহকারে ঘোষণা ক'রে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করার জন্যই আমার মত বিদ্রোহীদের জন্ম—এই প্রতি-বাদ ভিন্ন প্রণালীতে কীর্তনকাররাও ক'রে গেছেন।'

২ 'আমরা যাকে হিন্দুস্থানী সংগীত বলি তার মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে গানের তত্ত্ব, আর একটা গানের সৃষ্টি। গানের তত্ত্বটি অবলম্বন ক'রে বড়ো বড়ো হিন্দুস্থানী গুণী গান সৃষ্টি করেছেন। যে যুগে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সেই বাদশাহী যুগের প্রভাব আছে তার মধ্যে। দেশকালপাত্রের সঙ্গে সঙ্গতিক্রমে তাঁদের সেই সৃষ্টি সত্য, যেমন সত্য সেকেন্দ্রাবাদের প্রাসাদের স্থাপত্য। তাকে প্রশংসা করব কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে নূতন দেশকালপাত্রে হুঁচট খেয়ে সেটা সত্য হারাবে।'

৩ 'প্রত্যেক যুগের মধ্যেই এই কান্নাটা আছে 'সৃষ্টি চাই'। অনাযুগের সৃষ্টিহীন প্রসাদভোগী হয়ে থাকার লজ্জা থেকে যে তাকে রক্ষা করবে তাকে সে আহ্বান করছে।' [সুর ও সংগীত]

রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনটি উদ্ধৃতিতেই এক কথা—ভারতীয় রাগসংগীত তার সৃজনকালে সত্য কিন্তু শাশ্বত নয়। পরিবর্তমান নতুন যুগের মূল্যবোধে সে রাগসংগীত অচল এমনকি এক শ্রদ্ধেয় স্মৃতিমাত্র। রবীন্দ্রনাথের মতামত অনুকরণ করলে দেখি তিনি হিন্দুস্থানী সংগীতের কথাহীনতা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি ঘরানার অনুশাসন লক্ষ্য করেছেন, তানকর্তবের বিরুদ্ধে ব্যথিত হয়েছেন, তেলেনার ভাষা-হীনতায় দুঃখিত হয়েছেন। সেইজন্যই তাঁর মত কথা-কবির পক্ষে হিন্দুস্থানী সংগীতকে অপরিবর্তমান স্মৃতিস্তম্ভ মনে করা স্বাভাবিক। আমরা কিন্তু রাগ-সংগীত এবং হিন্দুস্থানী সংগীতে অনেক পরিবর্তন-চিহ্ন খুঁজে পাই। ধ্রুপদ থেকে খেয়াল এবং ঠুংরিতে উত্তরণ যথেষ্ট প্রাগ্রসরতার চিহ্নবাহী। রাগসংগীতে প্রাদেশিক সুরধারাও যে গৃহীত হ'ত তার প্রমাণ সিন্ধু, বঙ্গালী, সৌরাষ্ট্রী, গুর্জরী প্রভৃতি রাগিণীর নামে। সংগীতে ব্যক্তিগত স্পর্শের প্রমাণ বিলাসখানী টোড়ি, মিঞাকী মল্লার, ধোন্দি মল্লার, সুরদাসী মল্লার, হোসেনী কানাড়া প্রভৃতিতে।

তবু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ভ্রান্ত নয়। হিন্দুস্থানী সংগীতে পরিবর্তনপ্রয়াস গত কয়েক শতাব্দী সত্যই অনুপস্থিত। গত এক শতাব্দীর হিন্দুস্থানী গান মানেই গতানুগতিকতা। নবসৃষ্টির প্রয়াস সেখানে নেই। পবিত্র দেবতার মত ভারতীয় রাগসমূহের স্বর-গ্রাম বংশানুক্রমে পূজিত হচ্ছে। নতুন যুগের নতুন চাহিদা কথার প্রতি তার আকর্ষণই নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন : 'বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে বাংলাসংগীত তাই হওয়া চাই। এই মিলনসাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে,—আর অনিন্দনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে।'

ভারতবর্ষের সংগীত-ইতিহাসে ভাষাগীত রচনায় বাঙালী কবিরা পূর্বাপর সচেষ্ট। কিন্তু এই প্রয়াসে একমাত্র বাংলাদেশই অংশীদার নয়। উত্তরভারতীয়রাও এ ব্যাপারে আমাদের সহযাত্রী। ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য এবং সংগীতের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে আমরা এক অসাধারণ ভাববিপ্লবের পরিচয় পাই মধ্য-যুগে।

এখনকার ভারতীয় সংগীত বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অন্তত কর্ণাটকী এবং উত্তরভারতীয় সংগীতরীতির কথা সবাই জানেন। কর্ণাটকী অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতই এখনও পর্যন্ত ভারতীয় মার্গ-সংগীতের ধ্রুবপদ্ধতি অল্পানভাবে ধারণ ক'রে রেখেছে এমন বলা হয়। যদিও এই ধারণা সম্পূর্ণ তথ্যসম্মত নয়। কিন্তু একথা অসত্য নয় যে, উত্তরভারতীয় ধ্রুব-সংগীত বারেবারে পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ যুগোপ-যোগী হয়েছে। ভারতীয় সংগীত প্রধান পরিবর্তন লাভ করল চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমান আক্রমণ থেকে। তার আগে 'The temple and the stage were the great schools of Indian music'। এই সময় নাচত আর গাইত মহিলারা আর বাদ্যযন্ত্রে তালরক্ষা করত পুরুষরা। অনুতাল-তানকের সঙ্গে যবাকৃতি মুরজ,

তার সঙ্গে বেণু ও বীণার সংযোগ। বেজে উঠত তন্ত্রী-পটহিক আর কাহল। কিন্তু এই শান্ত ধ্রুবসাধনায় বাধা পড়ল। নবাগত পারসিক সংগীতের উচ্ছল স্পর্শে ধ্রুপদ কেঁপে উঠল। সূচনা হল খেয়ালের। তারপর ঠুংরি, টপ্পা। শান্ত অনুদ্বেল মার্গসংগীত নির্বাসন নিল দক্ষিণভারতে। তার নাম হ্ল কর্ণাটকী সংগীত। আর উত্তরভারতীয় সংগীতের নবীনযাত্রা শুরু হল নব নব পথে। তার মধ্যে ভজন অন্যতম। কে না জানে ভজন উত্তরভারতের এক অনন্য ভাষাগীত। যার বাণী-রচনা করলেন তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাইয়ের মত কবি, সুরমণ্ডিত হল রাগসংগীতে। ঠিক সমকালে অর্থাৎ চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীব্যাপী বাংলা-দেশেও ভাষাগীতের আত্মপ্রকাশ ঘটল কীর্তনে। তাতেও কথা ও সুরের সুনিপুণ সংযোগ।

ভজন এবং কীর্তন আসলে ভক্তিসাধনার এক রসময় প্রকাশ। এর উদ্‌ভবপর্বে ভারতীয় ধর্মবিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস আছে। শঙ্করাচার্য নবম শতাব্দীতে বিদায় নিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিল কয়েকশতাব্দীব্যাপী অনুশীলিত অদ্বৈতপন্থা। ঋজু ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের কৌলীন্যে ফাটল ধরল। আর এই সময়ই সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার বেড়া ভেঙে অপভ্রংশের নীহারিকা থেকে রূপলাভ করল বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা। অর্থাৎ ভাষাগীত রচনার ভূমিকা প্রস্তুত হ'ল। এর পর মুসলমান আক্রমণের অব্যবস্থিত পরিবেশ উত্তীর্ণ হ'তেই সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে শুরু হ'ল ভক্তিআন্দোলন।

ভক্তিআন্দোলন আসলে মধুরের সাধনা, জনতার ধর্মাচরণ। ভক্তিআন্দোলনের কর্মীদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ শাস্ত্রকে, সংস্কৃত শাস্ত্রপুরাণকে এবং সমস্ত শাস্ত্রীয় আচ্ছন্নতাকে প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা, প্রাঞ্জল করা এবং সকলকে অধিকার দেওয়া। তাই সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রদেশে প্রদেশে অনূদিত হতে থাকল। যার প্রমাণ তুলসীদাসের রামচরিতমানস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, আসামের কবি সাবলের মহাভারত। এসবই এক ভক্তি-আন্দোলনের ভাবময় রূপ। ভক্তি-উদ্বেল মধ্যযুগের কবিরা কৃষ্ণভজনার আবেগে হৃদয়ের সংগীতকে খুঁজে পেলেন। আর সেই আবেগ থেকেই সংগীতে কথা এল, সৃষ্টি হ'ল ভাষাগীত। উত্তরভারতের ভজন আর বাংলা-দেশের কীর্তন একই ভাষাগীতের যুগ্মরূপ। উভয়তই কথার স্বাধিকার এবং রাগশ্রীর সহায়তা। ধ্রুবসংগীতকে অগ্রাহ্য ক'রে নয়, স্বীকরণের মধ্য দিয়ে ভাষাগীতের জয়যাত্রা।

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। বাংলাদেশে কীর্তনের জোয়ারে নতুন নতুন ভাষাগীতের সৃজন চলল। রামপ্রসাদী শ্যামাসঙ্গীত অষ্টাদশ শতাব্দীকে প্রতিফলিত করল। আসন্ন নবযুগের আভাস দিল নিধুবাবুর প্রেমের গান। উনিশ শতকের প্রতিভাদীপ্ত বাঙালী কবিরা গ্রহণ করলেন ভাষাগীত রচনার দায়িত্ব। এবং 'ঘরোয়ানা পদ্ধতির শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন প্রদেশে বিশেষত বাংলায় নবজীবনের সূত্রপাত হচ্ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে নবজীবনের সূচনা হয় রঙ্গমঞ্চে। সব প্রদেশেই নাটকী-সঙ্গীতকে সঙ্গীতজ্ঞেরা ঘৃণা করতেন। কিন্তু ইতিহাসে কিছুই ঘৃণ্য নয়।' (কথা ও সুর। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

এবং সেইজন্যই বাংলা ভাষাগীতের ইতিহাস গৌরবময়। নাট্যনিবন্ধ ভাষাগীত বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই গীতোৎসাহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গীতিনাট্য রচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই গীতিনাট্যকে অবলম্বন করে ভাষাগীত রচনায় উৎসাহী হলেন। পরে সাংকেতিক নাটকে সংগীত সন্নিবেশ ক'রে তিনি নাটকের নিহিতার্থ গান দিয়েই ফুটিয়ে তুললেন। এমনকি নৃত্যনাট্যে ভাষাগীত সংযোজিত ক'রে অভিনবত্বের চূড়ান্ত করলেন।

তাই বলা চলে, বাংলাদেশে ভাষাগীতের অবিচ্ছিন্ন জয়যাত্রার মধ্যেই ভাষাগীতের সুনিশ্চিত শিল্পসাফল্যের স্বাক্ষর। কবিতা এবং সুরের এই পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন এক অভ্রান্ত শিল্পলোক সৃজন করছে প্রতিনিয়ত। উত্তরভারত ধর্মসাধনার সূত্রে তার সঙ্গে জড়িত হয়েও মানবসাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পায়নি। অথচ বাংলা ভাষাগীত অনায়াসে উচ্চারণ করে :

আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে?
দুয়ারে এঁকেছি রক্তরেখায় পদ্ম-আসন
সে তোমারে কিছু বলে?

যেকোন য়ুরোপীয়কে সংগীত কথাটা বল্লে তিনি ক্লাসিকাল যন্ত্রসংগীত বুঝবেন। কারণ য়ুরোপখণ্ডে সংগীত মানেই সুর এবং সেই সুর কণ্ঠবাহিত নয়, যন্ত্রমুখর। হ্যান্ডেল, হেড্‌ন্, বেতোভেন, শুবার্ট, ভাগনার—এইসব য়ুরোপীয় সংগীতশিল্পী সুরকার হিসাবে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। উচ্ছ্বসিত, অনর্গলিত, শান্ত-মন্থর, অন্তর্বেদনাতুর তাঁদের বিভিন্নধরনের সুরসৃজনে আমরা যে কেউ আশ্চর্য হই, খুশী হই এবং শ্রদ্ধানত হই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এঁরা কেন এই অসাধারণ সুরশ্রীতে বাণীযোজন করেন নি! তারপরেই মনে হয়, এই ভালো। এমন বিচিত্র অসমসুষমধ্বনিকম্পনে যেকোন বাণী ব্যর্থ হয়ে যাবে। কথা যে লোকে পেঁাছায় না এই সুর সেই অনন্তপ্রান্তরের শস্য।

তাই লক্ষ্য করি, য়ুরোপীয় সংগীত অনেক বেশি ভাবাত্মক, নৈর্ব্যক্তিক এবং শুদ্ধসত্ত্ব। তা যেমন বিচিত্র তেমনি উত্তাল। নির্বাণী অথচ মনের গহনে স্বপ্নের ফুল ফোটায়। সেইজন্যই যেকোন ভাল য়ুরোপীয় কম্পোজিশন শুনলে অনিবার্য ভাবে মনে হয় এর তুলনা নেই। এর বিচার চলে না।

য়ুরোপীয় সংগীতের এই সাফল্য আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে ভাবাত্মকতারই পুনরাবৃত্ত সাফল্য। য়ুরোপ কবিতা-চিত্র-সংগীতকে একই ভাবের স্বর্গে নিয়ে যেতে চায়। সেই প্রয়াস যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। য়ুরোপীয় সংগীত-সমালোচক Michael Ayrton -এর রচনাংশ উদ্ধৃত ক'রে সেই ভাবাত্মক প্রয়াসের একাংশের পরিচিতি দিতে চাই : The romantic trend towards programme music in the early nineteenth century provoked a spate of orchestral music directly resulting from emotions derived both from painting and literature. Literature naturally played the largest part. In a lesser degree painting played its part in the creation of the romantic movement. There is indeed a considerable quantity of Liszt's work, directly derived from the visual arts. Inspired by Michelangelo, Liszt composed 'II Pen-Seroso' and, after seeing a Raphael at Milan, he wrote his equally celebrated 'Sposalizio' [Music Inspired by Painting. Penguin Music Magazine, Vol. I, 1946] এই একটি উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে সংগীতক্ষেত্রে য়ুরোপের ভাবাত্মকতার সাধনার সুস্পষ্ট পথ।

তুলনা করলে ভারতীয় ধ্রুবসংগীতকে ভাবাত্মকতার ক্ষেত্রে অনগ্রসর বলতে হয়। এই অনগ্রসরতার কারণও আছে। য়ুরোপীয় ধ্বনিসমারোহ এবং ভারতীয় রাগমালায় মৌল পার্থক্য বেশি নেই। কিন্তু য়ুরোপীয় সুর যুগে যুগে নতুন নতুন শিল্পীর অনবচ্ছিন্ন স্পর্শে নিত্য অগ্রসরমান। চিত্রের ভাবকল্পনায় এই আধুনিক যুগেও য়ুরোপীয় সুর নূতনত্ব পাচ্ছে। অথচ ভারতীয় রাগমালা একটা নির্দিষ্ট যুগের পর প্রায় স্তব্ধ। সত্যিকারের সৃজনীস্পর্শ দিতে পারেন এমন শিল্পীর যেমন অভাব, রাগকে যুগোপযোগী করার সদিচ্ছারও তেমনই অনুপস্থিতি। অথচ ভারতীয় রাগসংগীতে চিত্রপ্রেরণার কথা সুবিদিত। রাগরাগিণীর রূপোদ্‌ঘাটনের সময় প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পীই মানসনয়নে প্রতিভাত করেন সেই রাগরাগিণীর রূপ। তাই ভৈরব রূপায়নে ফুটে ওঠে পিণাকীর রূপ। মল্লারে 'যৌবনদূনচিন্তা' মল্লারিকার রূপ। ইত্যাদি। পাশ্চাত্ত্য সংগীত গবেষক প্রিন্সিপ্যাল পারসি ব্রাউন এই বিচিত্র রাগরূপমণ্ডিত ভারতীয় সংগীতের নামকরণ করেছিলেন Visualized music। এই নামকরণের মধ্যেই ভারতীয় রাগসংগীতের খণ্ডতার আভাস। ভারতীয় সাধনায় ভাবাত্মকতার ভূমিকা সংকীর্ণ। শুদ্ধ সংগীতও তাই রূপময়।

আরেকটি কথা স্মরণীয়। ভারতীয় ধ্রুবসংগীত য়ুরোপীয় সংগীতের তুলনায় বৈচিত্র্যহীন। য়ুরোপীয় সংগীত বিভিন্ন বিচিত্র হৃদয়ানুভবকে রূপায়িত করতে পারে। কিন্তু ভারতীয় সংগীত মনের কতকগুলি স্থায়ী ভাবকে রূপায়িত করে মাত্র। তার মল্লারে বিকীর্ণ বিরহবোধ, বসন্তে উচ্ছ্বাস, পূরবীতে কারুণ্য, ভৈরবীতে বৈরাগ্যসুর। য়ুরোপীয় সংগীতে অনুভবের আরও অনেক সূক্ষ্ম অন্তর্বিভাগ আছে।

ভারতীয় সংগীতের আরেকটি ত্রুটি হার্মনির অভাব। বস্তুত জীবনের অসমসুষম সংগতিই হার্মনি। সুরের ক্ষেত্রেও শুদ্ধঅশুদ্ধ, বাদী-বিবাদী সবকিছু অসংগতির

পরিণতি পাওয়া উচিত 'এক চরম সংগীতের গভীরতায়'। য়ুরোপ সুরের ক্ষেত্রে সেই গভীরতা আবিষ্কার করেছে, ভারতবর্ষ পারে নি। তাই শুদ্ধ স্বরবাদনে মরমী ভারতীয়ের তৃপ্তি নেই। সেইজন্যই আমরা ভাষা খুঁজি। য়ুরোপীয় সংগীতে জীবনের সমস্ত সম্পদ এবং ভাবাত্মকতা সন্নিবিষ্ট। আমাদের সংগীতে তার অভাব আছে। আমরা তাই অনাত্ত পথসন্ধান করি। বুঝতে পারি, 'সুরহীন কবিতা শিখাহীন প্রদীপের মত'। তাই সুরের শিখায় সংগীতের প্রদীপসমারোহ জ্বালি।

ভাষাগীত কথাটির য়ুরোপীয় নামান্তর Song। এবং য়ুরোপে Song বলতে এক অগভীর শিল্পই বোঝায়। অত্যন্ত তরল সুরে, লঘুভাষায় লেখা তানধর্মী এই Song আর যা-ই হোক ভাষাগীতের গভীরতা নয়। এমন হওয়া স্বাভাবিক। যেদেশে যন্ত্রসংগীত প্রকাশের বাহন সেদেশে কণ্ঠসংগীতের এমন অমর্যাদা মর্মান্তিক কিন্তু সত্য। একমাত্র ইংলন্ড এই কণ্ঠসংগীতের সামান্য পক্ষপাতিত্ব করে ব'লে য়ুরোপীয় সংগীতবিদরা ইংরেজদের কবির জাত বলে এড়িয়ে যায়।

উপরন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এমন এক অসুস্থতা এসেছে যা সংগীতজগৎকেও আচ্ছন্ন করেছে। তার পরিচয় অধুনাতন আমেরিকার রকএন্‌রোল, ক্যালিপ্‌সো এবং জাজ্‌ গানে। এগুলিতে সংগীতের চেয়ে সংগীতহীনতাই প্রবলতর। তীব্রতালে, নৃত্যসহকারে গীত এই সব অসুস্থতার খবর অনেকে রাখেন এবং উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু আমাদের পক্ষপাত ভাষাগীতের প্রতি; যেখানে কবিতা এবং সুরের পরিণতরূপ। কথাটি সুপরিস্ফুট করা দরকার। কবিতা ও সুরের মিলন বলতে কবিতায় সুরারোপ বোঝাতে চাই না আমরা। বরং কবিতা এবং সুরের ঐক্যবদ্ধ অদ্বিতীয় প্রকাশ। দুয়ের সমন্বয় অথচ তৃতীয়ের সৃষ্টি। এই সৃজনকর্মে তাই মহৎ প্রতিভার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সে-প্রতিভার সিদ্ধতম শিল্পী।

বলা হয়ে থাকে, কবিতার ভাবানুযায়ী সুর বসানো হয় ভাষাগীতে। যেমন বেদনার্দ্র কবিতায় কোমল সুর, উদ্দীপক গানে তীব্র সুর। এ আমাদের এক মধুর ভ্রান্তি। এ ব্যাপারে বিদেশী পণ্ডিত বলছেন : 'We may suppose that the custom of setting sad songs to minor keys originated without any felt suitability of the key to the ideas, but that gradually, by repetition, we have come to connect the two, so that a piece of music in a minor key now usually appears to us sad or plaintive. There is nothing inherently sad about the minor key.'

ভাষাগীত এই সুরবশ্যতা স্বীকার করে না। সেখানে কথার আভাই গানের ভাবকে ফুটিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথের গানে কথা দিয়েই ভাব বিকশিত হয়। যেমন বর্ষার গানে তিনি প্রথাসিদ্ধ মল্লার রাগ না বসিয়ে বসন্তের সুর বসিয়েছিলেন এমন উদাহরণও আছে (স্মরণীয় : 'আমার মনে নবীনমেঘের সুর লেগেছে' গানটি)। ভাষাগীতের এই বিশেষ বাণীবৈশিষ্ট্য দিনেন্দ্রনাথের রচনায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'হিন্দী-গানে একথা ব'লে দেবার প্রয়োজন হয় যে, আমি পূরবী গাচ্ছি। সেই পূরবীর বিশেষ ঠাটকে আশ্রয় ক'রে আমার গান গাওয়া হল; কথার মধ্যে দিনান্তের করুণ মিনতির আভাসমাত্র নেই ব'লে সুর গেয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় যে, এটা দিন অবসানে গাওয়া উচিত; প্রকৃতির বুকের ভিতরকার কান্নার সুর আমি পূরবী রাগিণীতে রূপান্তরিত করেছি। কিন্তু আমি যখন গাই :

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
সন্ধ্যা বায়ে, শ্রান্ত কায়ে, ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে

তখন সুরটা পূরবী হ'তে বাধ্য, কিন্তু বলবার প্রয়োজন নেই, এবং তা'তে শুধু ধৈবত লাগালেও সৌন্দর্যের লাঘব হয় না।' [দিনেন্দ্ররচনাবলী]

ভাষাগীত সুতরাং কথা ও সমবায়ে সৃষ্ট অথচ তাদের অতিরিক্ত নূতন সৃষ্টি। কিন্তু ভাল ভাষাগীত রচনা করা দুরূহ কেননা সেক্ষেত্রে শিল্পীকে একই সঙ্গে ভাল কবি এবং সুরকার হ'তে হবে। সব সময় তা হয় না। তাই ভাল কবিতায় সুরসংযোগ করা যেতে পারে। তাতে অবশ্য কথা ও সুরের একই সৃজন হয় না ব'লে একটু ফাঁক থেকে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় সুরসংযোজিত গীতরূপ আমাদের ভাল লাগে। তাছাড়া যেদেশে ভাষাগীতের চর্চা নেই সেদেশে যদি ভাল কবিতায় সুর বসানো হয় তবে আনন্দ এবং সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। য়ুরোপে এই সুরসংযোজনা শুরু হয়েছে। Willi Apel জানিয়েছেন : 'Modern composers have been very careful in the selection of poetic texts for their songs, choosing only poems of outstanding literary value, and that, on the other hand, the 19th century development of poetry in which one encounters such outstanding figures as Goethe, Morike, Baudelaire, Mallarme has given a great impetus to the rise and development of the Song' [Harvard Dictionary of Music]। এই সংবাদে ভাষাগীতের দিগ্বিজয়চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, রসলিপ্সু শ্রোতারা শুদ্ধসংগীত এবং ভাষাগীত উভয়তই আনন্দ পান। দুইয়ের মধ্যে গভীরতর পার্থক্য থাকলেও আমরা সংগীতস্রোতে ভেসে যাই। এবং তারপর পরমবিশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি :

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাবো তাই জীবনগানে।

উত্তর-তিরিশের যুগের স্বনামধন্য কবি। তাশকেন্ত-এ অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক-সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই রচনাটি লেখকের অল্প কয়দিনের তাশকেন্ত বাসের একটি মধুর স্মৃতির আলেখ্য। রচনান্তর্গত ফোটোচিত্রগুলি উক্ত লেখকসম্মেলনের অধিবেশনকালে গৃহীত।

নাম মাশুরা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সম্মেলনের অন্তর্বর্তী প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে অগ্রণী বাঙালী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত ভারতীয় কথাশিল্পী, সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-পত্রিকা 'মার্গ'-এর সম্পাদক ডক্টর মুলকরাজ আনন্দকে—দেখা যাচ্ছে।

নাম মনে আছে। মাশুরা। আমাদের পাঁচতলার ফ্লোরগার্ল। মাশুরার সঙ্গে আর কখনই হয়তো আমার দেখা হবে না।

সবেমাত্র হোটেলে ফিরেছি। টেবিল থেকে একগোছা আঙুর ছিঁড়ে নিয়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালাম। বন্ধ শার্সির ভেতর দিয়ে আকাশের চেনা মুখ। শহরের অনেকখানি দেখা যায়। নিচে কালো চওড়া পাড়ের মতো তকতকে রাস্তা। রাস্তাটা পেরোলেই নাভোই থিয়েটার। গাছের কেয়ারি করা সুন্দর বাগান। সামনে প্রকাণ্ড ফোয়ারা। বাগানে গিজগিজ করছে লোক। স্টলে স্টলে বিক্রি হচ্ছে মুড়িমুড়কির মতো বই। ডান-দিকে হনহনিয়ে চলেছে লোক-ঠাসা তিন-মহলা ট্রাম। মোড়ের মাথায় রংবেরঙে শরবতের দোকান। অবেলায় অল্প অল্প কুয়াশায় লেপামোছা বাড়ির পর বাড়ি।

সম্মেলন আজ শেষ। কটা দিন স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কাটল। তাশকেন্ত ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট হবে। মাথায় কদমছাঁট চুল, ইংরেজি-না-জানা শরীরচর্চাবিদ্ প্রৌঢ় সেই পালোয়ান, চোখে যার উপছে পড়ছে ভালো-বাসা—রাস্তার ভিড়ের মধ্যেও তাঁকে আমি চিনতে পারছি। হোটেলের সারবাঁধা পৈঁঠের ওপর দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে মহম্মদভ, সারাক্ষণ আমরা যার পেছনে লাগি। গাড়ি থেকে নামল লানা, মোরগ-ঝুঁটি খোঁপায় যাকে ভারি সুন্দর দেখায়।

টেবিলে বসে দামোদরন লিখছে। জানলায় পর্দাটা টেনে বিছানায় লম্বা হলাম। সন্ধেবেলা অপেরায় যাওয়ার আগে একটুখানি জিরিয়ে নেওয়া যাক। ঘরের মধ্যে নতুন কাঠের আসবাবে বার্নিশের গন্ধ। পুরো হোটেলটাই আনকোরা নতুন। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় একটা দিকে তখনও ভারা বাঁধা। ভেতরের উঠোনে ছোট বড় তক্তা আর চুনবালির ছড়াছড়ি।

পর্দাটা সরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ঢুকল—ও হরি, মাশুরা। পেছনে গুটিগুটি পা ফেলে আরেকজন। কুণ্ঠাজড়িত এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা। সারা মুখে শীতের ফাটার দাগ।

মাশুরার ইংরেজিজ্ঞান আমার মতোই। তবে বলতে আটকায় না।

'মনে আছে তো? আমাদের বাড়ি যাবে বলেছিলে! মা এসেছেন বলতে।'

মাশুরার মা? পরনে শাড়ি আর হাতে দায়মলকাটা চুড়ি থাকলে আমাদের গোলবানুর মা বলে চালিয়ে দেওয়া যেত।

গোড়ার দিকে একদিন বলেছিলাম বটে মাশুরাদের বাড়িতে যাবো। ভোজ আর বৈঠকের হিড়িকে আমরা ভুলে গেলেও মাশুরা ঠিক মনে করে রেখে দিয়েছে।

মাশুরার বয়েস ষোলো কিংবা সতেরো। একেবারে ছেলেমানুষ। মঙ্গোল ধাঁচের লম্বা মুখ। তালপাতার সেপাই। নড়তে চড়তে পেছনের লম্বা বেণীটা দোলে। মাশুরার মার বয়েস চল্লিশের নিচে। বেঁটেখাটো দোহারা চেহারা। বিদেশী মানুষের সামনে লজ্জা পাওয়ার ভাব করে মেয়েকে ধরে আছে।

অনেক বলেকয়েও মাশুরার মাকে বসানো গেল না। অগত্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হল। মাশুরার মা উজবেক ছাড়া কিছু জানে না। আলাপ জমবার কোনো উপায়ই নেই। হঠাৎ ভারতীয় গানের কথা উঠল। আর সেই সময় মাশুরার মাকে দেখতে হত। মেয়ের হাতটা ছেড়ে দিয়ে মাশুরার মা সমস্ত শরীর দিয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে প'ড়ে বলে উঠল, 'ওচিন খরশো!' 'ওচিন খরশো!' কথা দুটো আমার জানা ছিল। বাংলা ভাবার্থ করলে দাঁড়ায়, 'কী যে ভালো! কী যে ভালো!' মিনিট খানেক ধরে বারে বারেই সে কথাদুটো উচ্চারণ করল। ভারতীয় গান যতটুকু সে শুনেছে, তা 'বৈজু বাওরা' আর 'আওয়ারা' ছবিতে। মুহূর্তে আমাদের মাঝখান থেকে দেশের সীমান্ত আর ভাষার পাঁচিল যেন উঠে গেল। মাশুরার মার দুটো চোখ ছলছল করছিল আনন্দের অশ্রুতে।

হোটেলের বারান্দায় গিয়ে চারজনে একসঙ্গে ফটো তোলা হল। মাশুরা আগে থেকেই একজনকে ব'লে রেখেছিল। যাবার সময় মাশুরার মা অসঙ্কোচে আমা-দের হাত ধরে বলল, 'এসো কিন্তু। নইলে ভীষণ রাগ করব।'

পরদিন ঠিক সময়ে মাশুরা এসে হাজির। নিচে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলাম: যাবার কী উপায়?

মাশুরা এদিক ওদিক ঘুরে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা গাড়ি যোগাড় করে ফেলল। খুব জবর একটা গাড়ি। ভল্গা।

যেতে যেতে শহরের চেনা রাস্তা পড়ল। কার্ল মার্ক্স

স্ট্রীট। দোকানপাটে সরগরম। অলিগলি দেখে মনে হল শহরে চায়ের চেয়েও শরবতেরই চল বেশী। আর ঘড়ি মেরামতের দোকান। এত লোকেরও ঘড়ি আছে, আর এত ঘড়িও খারাপ হয়! বইয়ের দোকানগুলোতে গিজগিজ করছে লোক। দোকানেও কুলোয় না। এদেশে চিরুনির মতো ওদেশে বইয়ের ফেরিওয়ালা। আরও একটা চেনা রাস্তা। পুশকিন স্ট্রীট কি? হবেও বা। গাড়ি এবার জলের নালাটা পেরোল। এবার মোড় ঘুরলেই রেলের ওভারব্রিজ। তাহলে শহর ছাড়িয়ে এলাম।

কত মাইল যেতে হবে? বিশ কি তিরিশ কিলো? কিলো-টিলো বুঝি না। মনে হচ্ছে বেশ খানিকটা পথ। বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় কোন্‌টা কবেকার। সামনে হাওয়া-বন্ধ-করা উঁচু-উঁচু পাঁচিল আছে? তাহলে সাবেক কালের। রাস্তার লোকের চোখ যাতে অন্দর মহলে না যায়। নতুন বাড়িগুলো আধুনিক—পাঁচিলের বালাই নেই।

গাড়ি এবার বাঁদিকে ঘুরল। সারি সারি তুলো-চাষীদের খেতখামার। মাঠে যারা কাজ করছে, তাদের ময়লা পোশাক। বিদেশী নাক-উঁচু অতিথিদের মধ্যে কে একজন একদিন বলেছিল, 'তাহলেই দেখো, তোমাদের ভালো জামাকাপড়ের কত অভাব।' মহম্মদভ জবাব দিয়েছিল ভালো, 'তোমাদের দেশের চাষের খেতে বুঝি ধুলোমাটি নেই—না কি মাঠে মাঠে ফরাস পাতা?' শুনে ভদ্রলোক চুপ হয়ে গিয়েছিল।

রাস্তার দুপাশে ঢালাও মাঠ; মধ্যে মধ্যে বাড়ি। কোথাও যৌথ, কোথাও সরকারী আবাদ। যেতে যেতে মাশুরা বলছিল, 'আগে এসব জায়গা ছিল মরুভূমির মতো। চারিদিকে ছিল জলের হাহাকার। সোভিয়েট হওয়ার পর এত সব হয়েছে।'

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। তবু রাস্তা ফুরোতে চায় না। মাশুরা ড্রাইভারকে রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। এ যাত্রায় মাশুরাই আমাদের দোভাষী। দামোদরন ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল।

নাম তার রাইয়েবস্কি সেরগেই নিকলাইয়েবিচ। মন্ত্রীদপ্তরের গাড়ি চালায়। বয়েস চল্লিশের কম; দেখায় চল্লিশের বেশী। ড্রাইভার বলেই বোধহয় বই-পড়া তার নেশা। কথা বলতে পেরে রাইয়েবস্কি ভারি খুশী। এবার গ্রামের ছোট রাস্তা। খানিকটা যাবার পর রাস্তা সাঁ করে নিচেয় নেমে গেছে। রাইয়েবস্কি সমানে কথা বলছে। তার স্টীও কাজ করে। শহরের এক দোকানে। উজবেকরা বলে 'দুকান'। গাড়ি বিদ্যুৎবেগে নামছে। কথা বললেও রাইয়েবস্কি পাকা ড্রাইভার। আর একটা নয়ানজুলি। গাড়িটা হেসে খেলে সাঁকো পার হল।

গাঁয়ের অলিগলি রাস্তা। এবার গাড়ি খুব আস্তে চলছে।

রাইয়েবস্কিদের রোজগার দুজনে মিলে হাজার দেড়েক। দুই মেয়ে। বড়টি স্কুলে যায়, ছোটটি কোলে। ছোট্ট সংসার ভালোভাবেই চলে। তার পূর্বপুরুষরা রুশ দেশ থেকেই এসেছিল। তার জন্মভূমি উজবেকিস্থান। সে নিজেও বছর সাতেক মস্কোর কাছেই থেকেছে। এক রুটি কারখানায় কাজ করত। ওখানে ঠাণ্ডা বেশী। রাইয়েবস্কির ঠিক পোষায় নি। তা ছাড়া ওদেশে আঙুরখেত নেই। চালানী আঙুরের বড় দাম। তাই সে জন্মভূমিতেই আবার ফিরে এসেছে।

মোড় ঘুরতেই গাড়ির শব্দে একদল মুর্গী ক'ক'র-কো ক'ক'র-কো করতে করতে পাখা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল। মাশুরা বলে উঠল, 'এটাই আমাদের কোল-খোজ।' তারপর একটার পর একটা সুন্দর বাড়ি দেখিয়ে বলতে লাগল, 'এইটে হল কোলখোজের আপিস-ঘর। ঐটা দোকান। এইটে আমাদের ক্লাব। এটা ইস্কুল। চেয়ে দেখলাম—সত্যিই, গর্ব করে বলবার মতো গ্রাম বটে মাশুরাদের।

একটা বাড়ির সামনে এসে মাশুরা গাড়ি থামাতে বলল। আমরা নামলাম। বাঁ হাতে রাস্তার গায়েই মাশুরাদের বাড়ি। বাইরে ছেলে কোলে করে কে যেন বসে। আমাদের দেখে লজ্জা পেয়ে ঘুরে বসল।

ভেতরে ঢুকলাম। মোটা দেয়ালের পুরনো সাবেকী ধরনের মাটির বাড়ি। চুনকাম-করা। জানালাগুলো কাঁচের। দালানে একটা লোহার খাট। বড় একটা কুলুঙ্গিতে ছোট একটা রেডিও। ইলেকট্রিক আলোর পয়েন্টটা বেশ নিচুতে।

উঠোনের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে তরিতরকারির

সম্মেলনে ভাষণপাঠরত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

উজবেক গ্রামবাসীদের মধ্যে বাঙালী প্রতিনিধি শ্রীগোপাল হালদার।

গাছ। একদিকে ফুলের বাগান, আরেকদিকে ফলের। আর মাচাভর্তি আঙুর। হে'সেলের ঠিক পাশেই খোলা জায়গায় পাশাপাশি দুটো উনুন। প্রকাণ্ড দুটো কড়াইতে আঙুরের রস জ্বাল দিচ্ছে মাশুরার বুড়ী ঠাকুমা। আমাদের দেখে কী খুশী যে বলা যায় না। হে'সেল বলতে বেশী করে চোখে ঠেকল রুটি সেঁকার জায়গা।

চারিদিক ঘুরে দেখে আমরা ঘরে এসে বসলাম। মেঝের ওপর বিছানা পাতা। আর খানকয়েক তাকিয়া। মাঝখানে বড় একটা জলচৌকি। তার ওপর প্লেটে সাজানো টফি-বিস্কুট মণ্ডা-মিঠাই। মাশুরা সামোভারে চা ফুটিয়ে আনল।

খানিক বাদে এল মাশুরার বাবা। লম্বা পাঠান-পাঠান চেহারা। মাশুরার বাবা ভালোমত রুশও জানে না। দামোদরন জানত কাজ-চালানো গোছের রুশ। কোনো কাজে এল না। মাশুরার ডাক পড়ল। বেচারা কতদিক সামলাবে?

দেরি হওয়ার জন্যে মাশুরার বাবা গোড়াতেই মাপ চেয়ে নিল। আঙুরখেতের কাজে আটকে গিয়েছিল।

মাশুরার বাবার নাম কারাবায়েভ গোলাম। জোয়ান চেহারা। বয়েস ষাটের কাছাকাছি। যুদ্ধে গিয়েছিল। সারা গায়ে গুলির দাগ। স্মোলেন্স্ক্, কিয়েভ, নভোগোরুদ—সব জায়গাতেই সে ছিল। যুদ্ধের পেন্সন পায় মাসে একশো রুবল। তা ছাড়া আঙুরখেতে কাজ করে নগদ বিশ রুবল রোজ পায়। মাশুরার বড়দিদির কম বয়েসেই বিয়ে হয়ে গেছে। আর আছে ছোট তিনটি ভাই। ওরা বড় হলে মাশুরার বাবার ছুটি।

আমরা থাকতে থাকতে ভিনগাঁ থেকে মাশুরার জ্যাঠা এল। আর তারপরই টেবিলের চেহারা গেল বদলে। বড় বড় প্লেটে গরম গরম খাবার আসতে আরম্ভ করল। এলাহি কাণ্ড। রুটিই তিন রকমের। মশলা দিয়ে গরগরে করে রাঁধা মাংসের রকমারি ডিশ। ছুরিকাঁটার বালাই নেই। সব শেষে বিরিয়ানি পোলাও; একই পাত্র থেকে সকলে মিলে হাত ডুবিয়ে খাওয়া। আপত্তি করলে চলবে না। এটাই প্রথা।

শেষ পর্যন্ত অনুরোধে উপরোধে আইঢাই হয়ে প্রাণ যাবার দাখিল। উঠোনে গিয়ে কোনোরকমে গরম জলে হাত ধুয়ে ঘরে এসে লম্বা হতে হল। ঘরে বসে থেল শুধু পুরুষরা। মাশুরাকে বলব কি, সে তো পরিবেশনেই ব্যস্ত।

কিন্তু মাশুরার মা? তাকে তো ধারেকাছে কোথাও দেখলাম না! মাশুরাদের গ্রাম মুসলমানপ্রধান। গ্রামে মৌলবী আছে, মসজিদ আছে। মাশুরার জ্যাঠা এখনও তিন ওক্ত নমাজ পড়ে।

মাশুরাকে দেখে বোঝা যায় এ বাড়িরও হাওয়া বদলাচ্ছে। গাঁয়ের মক্তব থেকে পাশ ক'রে বেরিয়ে মাশুরা এখন তাশকেন্তে আইন পড়ছে, ইংরেজি শিখছে। রুশ তো অনর্গল বলে যেতে পারে।

আমাদের দেখাবে বলে মাশুরা কুলুঙ্গি থেকে এক-রাশ বই পেড়ে আনল। পুশকিন, তলস্তয়, গোর্কী তো আছেনই, সেই সঙ্গে আছেন তাগোর—আমাদের রবি ঠাকুর। বই হল মাশুরার প্রাণ। হাতে পয়সা জমলেই সে বই কেনে। যত্ন করে তুলে রাখা একগোছা ফটো মাশুরা আমাদের দেখাল—বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তোলা ছবি। ডিপ্লোমা নেবার সময় গাউন-পরা তার ছবিটা মাশুরার বাবা গর্ব করে আমাদের দেখাল।

আশপাশের অন্য কোলখোজের তুলনায় এ-কোলখোজের অবস্থা ততটা সুবিধের নয়। তা না হলে মাশুরার বাবা অনেক আগেই এই পুরনো বাড়িটা ভেঙে নতুন একটা পাকা বাড়ি তুলতে পারত। মাশুরার বাবার এতদিনে সামর্থ্য হয়েছে নতুন দালান-কোঠা তোলবার। এই বছরেই তাদের বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে।

বেলা হল অনেক। এবার উঠতে হবে।

জুতো পরবার সময় নজরে পড়ল ড্রাইভার রাইয়েবস্কির পায়ে বীভৎস কাটার দাগ। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে বলল, 'কাটা দাগটা দেখছ? ওখানে গুলি লেগে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।' তারপর একটু থেমে বলল, 'ও দাগ যুদ্ধের। আচ্ছা বলো তো, আমেরিকা কেন মিছিমিছি যুদ্ধ চাইছে? যুদ্ধ বড় খারাপ। আমরা শান্তি চাই রুটির জন্যে। দুনিয়ায় যেন যুদ্ধ আর না হয়। তার চেয়ে আমরা তোমাদের আঙুর দেব, তোমরা তার বদলে আমাদের অন্য কিছু দিও।'

আমি যেখানে তাকালাম সেও একটা গুলির দাগ। কারাবায়েভের ঠিক কাঁধটার ওপর।

উপহার বিনিময়ের পালা।

বিদায় নিয়ে আমরা গাড়িতে উঠলাম। মাশুরা আমাদের বড় রাস্তা অব্দি এগিয়ে দিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'এতটা রাস্তা হেঁটে ফিরবে?'

মাশুরা বলল, 'হাঁটব কেন? শহর থেকে পড়ুয়াদের নিয়ে কোলখোজের বাস একটু পরেই গাঁয়ে ফিরবে। ওদের সংগে চলে যাব।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল হোটেলে আসছ তো?'

মাশুরা বলল, 'সম্মেলন অব্দি হোটেলে আমাদের কাজ ছিল। কাল থেকে আবার কলেজ।'

ও, তাহলে হোটেলে চাকরি করত না?

গাড়ি ছাড়বার আগে মাশুরা জোর করে আমাদের হাতে দুটো মোড়ক গুঁজে দিল। খুলে দেখি এক-গাদা বাড়ির-তৈরি টফি। গাড়ির জানলা দিয়ে অনেক-ক্ষণ ধরে হাত নাড়লাম।

হোটেলের ঘরে এসে টফির ভার হালকা করতে করতে মোড়কের মধ্যে হঠাৎ কী একটা হাতে ঠেকল। তুলে দেখি হাতে-বোনা এক জোড়া মোজা।

আমি আর দামোদরন—আমাদের দুজনেরই মনটার মধ্যে কী রকম করে উঠল।

বললাম, 'মাশুরাদের জন্যে চলো যাহোক কিছু একটা কিনে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।'

দামোদরন বলল, 'পাঠাবে যে, ঠিকানা জানো ওর?'

এতক্ষণে খেয়াল হল মাশুরার শুধু নামটাই জানি। গ্রামের নামটা তো জেনে নেওয়া হয় নি!

এশিয়া-আফ্রিকার ঐক্যের প্রতীক।

শিল্পীসত্তা

কিছু দৃশ্য বুকে চাই, কিছু দৃশ্য থাকুক আকাশে।
যখন চোখের সীমা দেয়ালের শেষ শুভ্রতায়
জীবনকে জেনে নেয় সম্ভবের সহজ অভ্যাসে;
কে তুমি তৃষ্ণার তুমি, তখন দারুণ অবেলায়
বুকের স্পর্ধাকে রাখো জ্যোতির্ময় শিল্পের মন্দিরে?
দেখছো না যারা ছিল তারা সব দূরে যাচ্ছে চলে
সমস্ত সুন্দর শ্রম সময়ের অন্ধকারে ফেলে,
তবু তুমি নিদ্রাহীন, তমোহীন, সৃষ্টির অস্থিরে!

অথচ গভীরে জানি ঈশ্বরের সম্মত গৌরব
তোমার আয়ুর কাছে প্রার্থনায় নতজানু আজো;
যে তুমি অনন্তজ্যোতি অতৃপ্তির দুঃখ হয়ে বাজো
ঘরের জানলা ভেঙে তাকে ওই বাহির উৎসব
একদিন ডেকে নেবে পাখির পাখার অবকাশে,

কিছু দৃশ্য বুকে চাই, বাকী সব থাকুক আকাশে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

শিল্পশাস্ত্র ও সাহিত্য

সাধন চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-উৎসাহী সাধন চট্টোপাধ্যায়—পেশায় লেখক না হলেও প্রায়শঃই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকেন। বর্তমান রচনায় তাঁর প্রগাঢ় শিল্পানুভূতি ও তার সুষ্ঠু-প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যাবে। বর্তমানে একটি অগ্রণী প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সম্প্রতিকালে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হোয়েছে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে-দুর্যোগ দেখা গিয়েছিলো এবং আশংকিত কোরে তুলেছিল বাংলার পাঠক সাধারণকে যে এবংবিধ নিকৃষ্ট সাহিত্যের অধিকতর প্রকাশ বোধহয় মননশীলতার দীনতারই লক্ষণ বা সৃষ্টিকর্মের অপটুতা এর একমাত্র নিদর্শন। বিশেষ কোরে বাংলা ভাষায় যে-সব উপন্যাস গত কয়েক বছর ধোরে প্রকাশিত হোয়েছে তা দেখেই এ-ধারণা বদ্ধমূল হোতে কোন বাধা নেই। তবে আশ্বস্ত হওয়া গেলো প্রবন্ধ-সাহিত্যে এর বিপরীত ভাব দেখে। এ-ক্ষেত্রে কিছু কিছু মননশীলতার পরিচয় সুদুর্লভ নয়। বিশেষ কোরে বর্তমান এক বছরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হোচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার-ময় নয়।

শিল্প-শাস্ত্র বা নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা বেশ কিছু-কাল ধোরে চলে আসছে বাঙলা দেশে। বাংলা ভাষায় এ বিষয় নিয়ে আলোচনা বোধ করি আচার্য অবনীন্দ্র-নাথ, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আচার্য নন্দলাল প্রভৃতি মনীষিগণ শুরু করেন। তবে শিল্পশাস্ত্রের অন্তর্গত স্থাপত্য-শিল্প সম্পর্কে ভালো কোনো বই বাংলা ভাষায় একেবারে নেই বোললেই চলে। বেশ কিছুকাল পূর্বে লিখিত হোলেও সম্প্রতি 'স্থাপত্য-শিল্পের ভূমিকা' এই নাম নিয়ে একখানা বই বাংলা ভাষায় আত্মপ্রকাশ কোরেছে। লেখক প্রকৃত বিজ্ঞজন এবং বিশেষ কোরে সত্যিকারের রূপদর্শী ও শিল্প-শাস্ত্রসচেতন।

লেখক মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ব্যবহারিক জীবনেও স্থপতি-শিল্প নিয়ে জীবন অতিবাহিত কোরেছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনসমূহ তিনি নিরীক্ষণ কোরেছেন এবং তার গঠনপদ্ধতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনাও কোরেছেন। ১৯১২ সালে লেখকের একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক 'ওরিস্যা অ্যান্ড হার রিমেন্‌স্' এই নামে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট সমাদর লাভও করে।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মশায় আলোচ্য গ্রন্থের মুখবন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা কোরেছেন এবং যুক্তি সহকারে। এবং উক্ত মুখবন্ধে নির্মলবাবু আরও একটি মূল্যবান সংবাদ পরিবেশন কোরেছেন যে বর্তমান লেখকের বহু অপ্রকাশিত রচনা এতদ্‌বিষয়ে বিদ্যমান যা সুযোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হোলে বাংলা সাহিত্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত হবে।

নির্মলবাবু শিল্প-শাস্ত্র সম্পর্কে ভারতবর্ষে জীবিত মনীষীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর বক্তব্য অনুধাবনের যোগ্য। তিনি বোলেছেন, 'ইহা (এই গ্রন্থ) যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনই মৌলিকত্ব গুণে সমৃদ্ধ'।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক স্থাপত্য-শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা কোরেছেন, যেমন—শিল্প ও সভ্যতা, স্থাপত্য ও বিধিনিষেধ, স্থাপত্য-সংগতি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, স্থাপত্যে কল্পনা, উপকরণের প্রভাব, স্থাপত্যের লক্ষ্য, স্থাপত্যে মৌলিকতা, গ্রীক স্থাপত্যে সামঞ্জস্য, রোমান স্থাপত্যে সামঞ্জস্য, বাইজানটাইন স্থাপত্য, ধর্ম ও স্থাপত্য-শিল্প, স্মৃতিশাস্ত্র ও স্থাপত্য শিক্ষার প্রয়োজন, স্থাপত্যে রেনেসাঁস, মুসলমান স্থাপত্য, জৌনপুরের স্থাপত্য, স্থাপত্যে অলঙ্কার, ভাস্কর্যগত সাদৃশ্য, জীবনসংগ্রাম ও সৌন্দর্য, স্থাপত্যে সৌন্দর্য, সামাজিক শিষ্টাচার ও সৌন্দর্য, অলঙ্কার প্রাচুর্য, ভাস্কর্যের আতিশয্য, স্থাপত্য ও জ্যামিতিক ক্ষেত্র, স্থাপত্যে বৈষম্য ও সামঞ্জস্য, বৈপরীত্য ও সৌন্দর্য, সৌন্দর্য ও সরল রেখা, সৌধের আকৃতি, গৃহ-বিন্যাসে শ্রেণী ভাগ, বঙ্গদেশীয় চৌচাল, স্থাপত্যে সম্পূর্ণতা, অনুকরণে অধোগতি, সূত্রকার ও স্থাপত্য, চালুক্য রীতি, সৌধে বৈচিত্র্য, স্থাপত্যের প্রাণশক্তি ইত্যাদি। এই ফিরিস্তি পাঠে এটা সপ্রমাণ যে লেখক স্থাপত্য-শিল্পসম্পর্কিত যত জিজ্ঞাসা থাকতে পারে তার জবাব দিতে চেষ্টা কোরেছেন। এবং সে-চেষ্টা তাঁর সার্থকই হোয়েছে, লেখক সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে অলঙ্কৃত কোরতে সক্ষম হোয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বক্তব্য সম্পর্কে লেখকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও শিল্পানুভূতি বর্তমান।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো স্বল্প পরিসরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্থাপত্যরীতি নিয়ে ভারতীয় রীতির এক তুলনামূলক আলোচনা।

ত্রুটির দিকে বক্তব্য—কিছু কিছু টেক্‌নিকাল্ টার্ম্‌স্-এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন রোয়েছে আর তা ছাড়া বানান ভুলের পরিমাণ যথেষ্টই রোয়ে গিয়েছে। যদিও একটা শুদ্ধিপত্র দেওয়া হোয়েছে কিন্তু তার মধ্যেও সব অশুদ্ধি শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি।

পরিশেষে নিবেদন, এই অমূল্য গ্রন্থ বাঙালী গৃহস্থের গৃহস্থালীর অঙ্গ হিসাবে অলঙ্কৃত হোলে এই গ্রন্থকে এর প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হবে।

ফরাসী দার্শনিক ও নন্দনতাত্ত্বিক পণ্ডিত মারিতাঁ শিক্ষিত সমাজে পরিচিত তাঁর মৌলিক চিন্তা ও চিন্তার গভীরতার জন্যে। সচরাচর এটাই দেখা যায়

যে, দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তার অধিকাংশই দুর্বোধ্য রোয়ে যায় অন্ততঃ পাঠক সাধারণের কাছে। পাণ্ডিত্য তাকেই বলা চলে, যে-চিন্তার প্রকাশ লিখিত হোয়ে যে-বক্তব্যের রূপ নেবে সে-রূপ জনমানসে প্রতিফলিত হোতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বা বিশেষ কোরে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় একাধিক মনীষী ছিলেন যাঁদের রচনা ভাব-সমৃদ্ধ হোলেও বোধগম্য হোতে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। লেখক যে-বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা কোরেছেন, সে-বিষয় সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য বা সম্যক জ্ঞান না থাকলে রচনা অপকৃষ্টতায় পর্যবসিত হোতে বাধ্য। দুর্বোধ্যতা বিনাশ পায় প্রকৃত পাণ্ডিত্যের স্পর্শে।

বাঙলাদেশে বর্তমানে এমন একজন বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হোলো 'শিল্প-দর্শনের ভূমিকা' পাঠ করে। 'শিল্প-দর্শনের ভূমিকা' পুস্তক নয়, পুস্তিকা। তথাপি এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে লেখক শুভেন্দু ঘোষ তাঁর বক্তব্য সুচারুরূপে পরিবেশনে সক্ষম হোয়েছেন। চিন্তাশীল লেখক হিসাবে এঁকে ফরাসী দার্শনিক মারিতাঁর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

আলোচ্য পুস্তিকান্তর্গত বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য কোরলে দেখা যাবে যে পরিসর যত কমই হোক না কেন এর মধ্যে অনেক বিষয়েরই কথা লেখক আলোচনা কোরেছেন। পুস্তিকার সূচীপত্রে রোয়েছে—'শিল্প-দর্শন—অলঙ্কারশাস্ত্র না নন্দনতত্ত্ব? শিল্পের প্রেরণা—প্রথম প্রস্তাব, শিল্পের প্রেরণা—দ্বিতীয় প্রস্তাব, শিল্পের রস, শিল্প কেন? শিল্পে অসুন্দরের স্থান, শিল্পের বোধ্যতা, সত্য ও অসত্য, শিল্পের স্বরূপ, শিল্পের আঙ্গিক, শিল্পে বিষয় ও বিষয়ী, শিল্পে অধ্যাত্ম সাধনা, শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, শিল্প ও শিল্পী, শিল্প সমাজ ও শ্রেণী, প্রগতি শিল্প, শিল্প ও শ্রেণীধর্ম, শিল্প ও প্রোপাগ্যাণ্ডা।

প্রথম অধ্যায়ে শিল্পদর্শন কি বস্তু তার ব্যাখ্যা রোয়েছে খুবই সামান্য দু লাইনে এবং সহজ ভাষায়। নমুনা—"যাকে শিল্পদর্শন বোলছি, প্রাচীনেরা তাকেই বোলতেন অলঙ্কার-শাস্ত্র; এ যুগে তার নাম দেওয়া হোয়েছে নন্দনতত্ত্ব।

"প্রাচীন গ্রীকদের যুগ থেকে রেনেসাঁসের যুগ পর্যন্ত ইউরোপে শিল্পদর্শনকে বলা হত 'রেটরিক'; এ যুগে তার নতুন নামকরণ হোয়েছে 'ইস্থেটিক'।" অবশ্য সংজ্ঞা সবিস্তারে বোঝাতে আরো দু-চার লাইন সংযোজিত হোয়েছে। যেমন "প্রাচীনেরা শিল্পকে আত্মার স্মারক হিসাবে দেখতেন। তাঁরা অলঙ্করণ বোলতে বুঝতেন—অব্যক্তকে রূপকের সাহায্যে ঠিকমত, যথাযোগ্যভাবে প্রকাশন। তাই তাঁরা শিল্পদর্শনকে বোলতেন 'অলঙ্কারশাস্ত্র'—অর্থাৎ সেই শাস্ত্র যার সাহায্যে সর্বভূতাত্মরাত্মাকে একটা সুবোধ্য প্রতীকের মধ্যে ধরা যায়।"

"প্রাচীনেরা শিল্পের রসাস্বাদকে জানতেন 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ' বোলে, সুতরাং তাঁদের কাছে শিল্পদর্শন ছিল 'অলঙ্কারশাস্ত্র'। এ যুগের শিল্পরস শুধু ইন্দ্রিয়মনের তৃপ্তিসাধনে নিয়োজিত, সুতরাং এ যুগের শিল্পদর্শন হোয়েছে নন্দনতত্ত্ব।"

'শিল্পের প্রেরণা—দ্বিতীয় প্রস্তাব' প্রসঙ্গে লেখক বোলছেন—"শিল্প মানুষের প্রসারের পরিচায়ক, তার আত্মপ্রসারের পরিপোষক। শিল্পে মানুষ নিজের বিরাটত্ব—তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক সত্তাকে উপলব্ধি করে। শিল্পের সর্বোত্তম সার্থকতা মানুষকে তার স্বকীয় অসমীতার মধ্যে মুক্তি দিয়ে।" অন্যত্র লেখক বোলেছেন—"মানুষের যে-সৃষ্টি আমাদের চিত্তে রস সঞ্চার করে তাকেই আমরা বোলছি শিল্প।.....শিল্পের আদিতে রস, অন্তে রস। রস থেকে তার উদ্গম, রস-সঞ্চারেই তার চরম সার্থকতা। সুতরাং রস কি বস্তু তা বোঝা দরকার।

"'রস' শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ দুই রকম। 'রস্যতে ইতি রসঃ', আবার 'রসয়তি ইতি রসঃ।' দুই ভাবেই শব্দটাকে সাধা যায় এবং সাধা উচিত। যা রস্যায়িত করে অর্থাৎ যা আস্বাদ্য তাই রস, আবার যে রসস্বাদ করে সেও রস।"

এ একেবারে ভারতের মাটির নাড়ীতে গেঁথে রোয়েছে। উপনিষদের সেই অমর বাণী 'রসো বৈ সঃ'—তিনিই আস্বাদ্য ও আস্বাদক।

রস মর্ত্যকে জারিত কোরে অমৃতের স্তরে তোলে; খণ্ডকে অখণ্ডের মধ্যে ধারণ করে।

অধ্যায়ান্তরে লেখক বোলছেন—"শৈল্পিক উপলব্ধি প্রাকৃত সত্তার জিনিষ—সামাজিক সত্তার জিনিষ। অবচেতনার গুহায় তার বাসা। শিল্পের রস যত গভীর, প্রাণ যত সতেজ, তার উৎস অবচেতন মনের তত গভীর গুহায়।" অতীব সত্য।

শুভেন্দুবাবুর বক্তব্য অত্যন্ত সুমিত এবং সুস্পষ্ট। পূর্বেই বোলেছি তিনি স্বল্পপরিসরের মধ্যে তাঁর চিন্তা ও ভাবধারা স্বচ্ছভাবে যে রূপায়িত কোরতে পেরেছেন সেটা তাঁর অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক।

এই পুস্তিকার বহুল প্রচার আকাঙ্ক্ষণীয়।

আরেকখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হোয়েছে। সেখানি হোলো ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী লিখিত 'নন্দনতত্ত্ব'। পুস্তকখানি এমন একজন অধ্যাপক লিখেছেন যিনি 'নন্দনতত্ত্ব' নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা কোরেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা শাখায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু আলোচনা দুরূহ বোলেই আজো তা এ দেশে সহজলভ্য হয় নি। নন্দনতত্ত্ব যে শিল্পকলা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা নয় এ বোধ আমাদের দেশের অধিকাংশ সমালোচকেরই নেই। ডক্টর নন্দীর গ্রন্থখানিতে আমরা শিল্প ও সৌন্দর্যের সেই বিশ্লেষণ পাই যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দ্বারা পরিশোধিত এবং দার্শনিকসুলভ পরিমার্জনায় প্রোজ্জ্বল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সারল্যে ডক্টর নন্দীর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হোলেও আমরা স্থানে স্থানে ইতালীয় দার্শনিক-নন্দনতাত্ত্বিক বেনেদেতো ক্রোচের প্রভাব লক্ষ্য কোরেছি। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে গ্রন্থকার আপন বলিষ্ঠ মতবাদের স্বাতন্ত্র্যে ক্রোচেকে বারবার অতিক্রম কোরে গেছেন। ক্রোচের প্রভাববিষ্টতাই গ্রন্থকারের অপমৃত্যু ঘোষণা করে নি।

শিল্পে অধিকারভেদ, শিল্পীর বৈরাগ্য, শিল্পের মর্মকথা প্রমুখ প্রবন্ধগুলি গ্রন্থকারের মূলে অনুপ্রবেশের শক্তির স্বাক্ষর বহন কোরেছে। প্রাচীন ভারতীয় রস-শাস্ত্র এবং প্লেটো-আরিস্ততল-উক্ত নানান মত উল্লেখ কোরেছেন তিনি। কোথাও কর্তাভজনা করেন নি তিনি। তিনি এ সত্যে বিশ্বাস কোরেছেন যে ভাগ্নারের উত্তরাধিকারী গুরুদেবের যে সত্যকার স্মৃতি পূজা করবে তার মধ্যে ভাগ্নারকে অস্বীকার করাটাই বড় হোয়ে উঠবে। কেননা ভাগ্নার নিজে কখন কর্তা-ভজনা করেন নি। ডক্টর নন্দী 'রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদ-গুলির সুনিপুণ বিশ্লেষণ কোরে রবীন্দ্রনাথের নন্দন-তাত্ত্বিক মতবাদের দুর্বলতা দেখিয়েছেন। এতে কোরে কবি-কথিত কর্তাভজা না হবার নির্দেশটুকুই তিনি সাগ্রহে পালন কোরেছেন। কোথাও অসৌজন্য প্রকাশিত হয় নি কবির মতবাদিতার বিশ্লেষণে। 'রোঁলার শিল্পদৃষ্টি' শীর্ষক অধ্যায়ে গ্রন্থকার যে মমত্ব-বোধের সঙ্গে এই ফরাসী মনীষীর মতবাদের আলোচনা কোরেছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সম্বন্ধে আলোচনার পরিসর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাই হয়ত আলোচনাটি বিশ্লেষণধর্মা হয় নি তেমন-ভাবে যেমন হোয়েছে অন্যান্য আলোচনাগুলি।

গ্রন্থখানির ভূমিকায় কেন্দ্রীয় কৃষ্টিমন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবির গ্রন্থখানিকে যে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন আমরাও তাঁর অনুসরণে গ্রন্থকার এবং গ্রন্থটিকে সাদর সংবর্ধনা জানাচ্ছি। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার আমাদের কাম্য। আশা করি আমাদের সে কামনা অপূর্ণ থাকবে না।

১। **স্থাপত্য-শিল্পের ভূমিকা**—
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় **মূল্য চার টাকা**

২। **শিল্প-দর্শনের ভূমিকা**—
শুভেন্দু ঘোষ **মূল্য দু টাকা**

৩। **নন্দনতত্ত্ব**—
ডঃ সুধীরকুমার নন্দী **মূল্য পাঁচ টাকা**

খবরাখবর

রাজমাতা শিল্পী শ্রীমতী সুচারু দেবী।

গত ১৯ই ডিসেম্বর ময়ূরভঞ্জরাজমাতা শিল্পী শ্রীমতী সুচারু দেবী দেহত্যাগ করেছেন।

সুচারু দেবী ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয় কন্যা। তিনি একাধারে ছিলেন শিল্পী, কবি, শিক্ষাব্রতচারিণী, মহিলা-আন্দোলনের নেত্রী। এ রচনায় তাঁর শিল্পপ্রতিভা সম্পর্কে দু-একটি কথা আলোচনা করব।

সুচারু দেবীর শিল্পানুরাগ তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। অনেকেই হয়তো জানেন না যে কেশবচন্দ্র শিল্পীও ছিলেন। ক্যালিগ্রাফি, কাঠখোদাই, এচিং ও চিত্রাঙ্কনে তাঁর প্রচুর দক্ষতা ছিল। কাঠের কাজ ও অন্যান্য হাতের কাজ সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মানন্দের যখন মহাপ্রয়াণ হয় সুচারু দেবী তখন দশ বছরের বালিকা মাত্র। কিন্তু ঐ বয়সেই পিতার শিল্পপ্রাণতা অলক্ষ্যে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। আর মাতা সতী জগন্মোহিনীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন ফুল দিয়ে ঠাকুরঘর সাজানোর অনুরাগ। এই অনুকূল পরিবেশের মধ্যে কৈশোরেই মহারানীর শিল্পপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর দিদি সুনীতি দেবীর বিদগ্ধ মনের প্রভাবও এই সময় তাঁর উপর পড়ে।

যৌবনে সুচারু দেবী এক ইংরাজ মহিলা-শিল্পীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর কাছেই ওঁর অয়েলপেন্টিঙে হাতেখড়ি (অবশ্য শী টট হারসেল্‌ফ্‌—এটাই সত্য কথা)। বিলাতী চিত্রকলার সৌন্দর্যসাগরে ডুবে গেলেন তিনি। প্রথমে তিনি বেশি মনোযোগ দেন পোর্ট্রেট এবং ফিগার স্টাডির দিকে, পরে ল্যান্ডস্কেপ তাঁর মনকে বিশেষভাবে টেনেছিল। তাঁর এই সময়ে আঁকা ছবির কতকগুলি 'ভক্তি-অর্ঘ্য' ও 'প্রণতি'তে ছাপা হয়েছে। রঙের সামঞ্জস্য ও গভীরতা তাঁর প্রথম দিকের চিত্রগুলির বিশেষ সম্পদ।

ময়ূরভঞ্জরাজমাতা অঙ্কিত কয়েকটি তৈলচিত্রের প্রতিলিপী।

ময়ূরভঞ্জরাজমাতা শিল্পী শ্রীমতী সুচারু দেবী। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের অন্যতম কন্যা।

মৃত্যুর কয়েক দিন আগে পর্যন্ত, ছিয়াশি বছরেও তিনি রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা কোরে অগণিত ছবি এঁকে গেছেন। নির্বাণোন্মুখ দৃষ্টি নিয়ে আর ফিগার ড্রয়িং করতে পারেন না বোলে আক্ষেপ কোরতেন, কিন্তু অন্তরের সমস্ত আকৃতি যেন ল্যান্ডস্কেপ, সীস্কেপ-এর মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। ভক্তিরসে পরিপ্লুতা এই মহীয়সী মহিলা ফুল আঁকতে বড় ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন জীবনসায়াহ্নে এসে সূর্যাস্তের মহিমময় দৃশ্য আঁকতে। কিন্তু এগুলির মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারের চেয়ে বেশি ছাপ থাকত সূর্যের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার—ভগবৎপ্রেমিকার অন্তরের আশার সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত সেই ছবিগুলি।

শুধু কি ছবি? রাংতা দিয়ে বইয়ের মলাট লাগানো, নানা রঙে মটো কার্ড লেখা, কাট-আউট তৈরি, গ্রীটিঙ্গস লেখা, ফুল সাজানো—তাঁর সব কিছুতেই একটা অপরূপ সুষমা লেগে থাকত। তাঁর ছবি আর ছবির বইয়ের সংগ্রহ—সেও ছিল অসাধারণ। ক্লাসিকাল পেন্টিং থেকে আলট্রা-মডার্ন আর্ট—সবকিছুর অনুরাগী ছিলেন তিনি। নানা যুগের নানা শ্রেণীর শিল্পী তাঁর কাছ থেকে প্রভূত প্রেরণা পেয়েছেন।

সুচারু দেবীর জীবৎকালে তাঁর ছবির প্রদর্শনী করতে পারি নি বোলে আমরা সত্যিই অপরাধী হয়ে আছি। নিজেও তিনি আড়ালে থাকতে ভালোবাসতেন। কিন্তু এত বড় শিল্পী-প্রাণের পরিচয় দেশকে দেওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পী-রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার।

আজ একান্ত প্রয়োজন। তাঁর স্মৃতিতে চিত্রকলার উপযুক্ত ছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত। এতে তাঁর আত্মা নিশ্চয়ই গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করবে। **—প্রভাত বসু।**

দিল্লীতে শিল্প-মেলা।

বিরাট আয়োজন এবারে আমাদের রাজধানীতে—বিশ্ব-কৃষিমেলা! ছোটো বড়ো বহু দেশ তাদের ভূমি-সম্পদ আর অরণ্যসম্পদের সবসেরা নমুনা নিয়ে এসে এখানে সাজিয়েছেন। একালে মানুষের অন্নোৎপাদন বিজ্ঞানসহায়ে কী দ্রুত বিকাশের পথে চলেছে তার চাক্ষুষ পরিচয় এ মেলায় উপস্থিত। আমরা শুনেছি, এ বিশ্বমেলায় পশ্চিম বাঙলার মণ্ডপটি সরল মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠ শিল্পসুষমায় বহু গুণী দর্শকের মনোহরণ করেছে। এ সংবাদে আমরা সকলেই আনন্দিত।

শিল্পী-রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার।

অসংখ্য অতিথির অবিরাম সমাগমে মুখর নয়া দিল্লীর অগণিত মাননীয় আগন্তুকের মধ্যে একজনের কথা সুন্দরম্ বিশেষ করে উল্লেখ করতে চায়। তিনি আইজেনহাওয়ার। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার শিল্পী ও শিল্পরসিক—সুন্দরম্-এর আকর্ষণ এই কারণে। আইজেনহাওয়ার শিল্পকলাকে ভালোবাসেন। চিত্রচর্চা, বিশেষ করে প্রতিকৃতি অঙ্কন, তাঁর অবসর যাপনের অঙ্গ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে উপহার দেবার জন্য তিনি যে একটি ব্রোঞ্জমূর্তি নিয়ে এসেছেন, এর মধ্যেও তাঁর গভীর শিল্পানুরাগের পরিচয় পাই।

ভিয়েতনাম-এর লোকশিল্প প্রদর্শন।

সম্প্রতি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে গণতন্ত্রী ভিয়েত-নামের এক শিল্পিদল এখানে এসেছিলেন। তাঁদের নৃত্য-গীত সত্যই আমাদের মুগ্ধ করে।

দিল্লীর বিশ্ব-কৃষি-মেলায় পশ্চিম বঙ্গের স্টলের একাংশ।

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীতে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল।

সম্প্রতি এক ভারতীয় প্রতিনিধিদল ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীতে সাংস্কৃতিক পর্যটনে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে গঠিত এই প্রতিনিধিমণ্ডলী জার্মানীতে সাংস্কৃতিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

সাহিত্যিক মিত্রের 'আকাদেমী পুরস্কার' অর্জন।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের জন্য 'আকাদেমী পুরস্কার' অর্জন কোরেছেন। শ্রীমিত্রের এই সাফল্যে আমরা আনন্দিত ও তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কথা-শিল্পী তারাশঙ্কর রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত।

সম্প্রতি বিখ্যাত কথা-শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় রাজসভার সদস্যপদপ্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত। আশা করি বাঙালী ও বাঙালী সাহিত্যিক-দের কণ্ঠস্বর দিল্লীস্থ শাসনকর্তাদের কানে যথার্থ-রূপে পৌঁছে দিতে তিনি পারঙ্গম হবেন।

গ্রন্থরচয়িতা প্রমথ বিশীর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ।

এবারের রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেছে যে ভাগ্যবান গ্রন্থ তার নাম 'কেরী সাহেবের মুন্সী'। গ্রন্থরচয়িতা শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান লেখক। শ্রীযুক্ত বিশীর পুরস্কার-প্রাপ্তিকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—সোমেন্দ্র মিত্র।

সুন্দরম্-এর ঋণ স্বিকার।

সুন্দরম্-এর এবারকার প্রচ্ছদ চিত্রটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। শিল্পী হেমন্ত মিশ্রর রঙিন চিত্র দুটি ভারত ফোটো টাইপের সৌজন্যে প্রাপ্ত এই সূত্রে তাঁদের সুন্দরম্ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

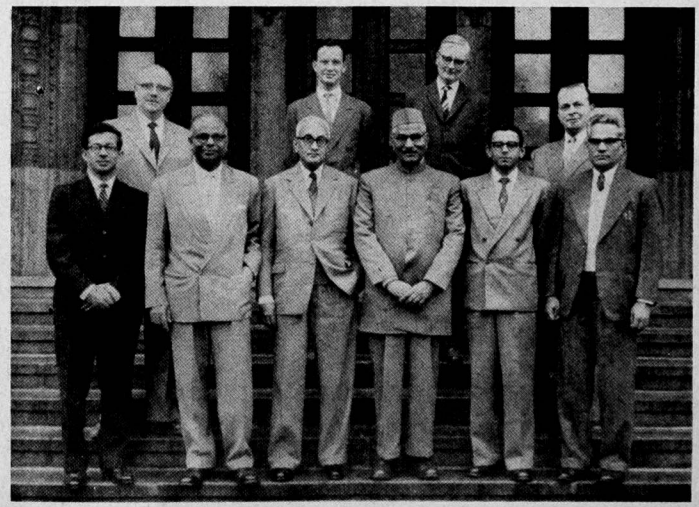

বাঁ দিক থেকে সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান—ডাঃ পি. কে. কবির ও ভারতীয় সাংস্কৃতি দলের অন্যান্য সদস্যরা।

দিল্লীতে আকাদমি পুরস্কার প্রাপ্ত কথাশিল্পী গজেন্দ্র মিত্র ও অন্যান্যরা।

ভিয়েৎনামের যে নৃত্যশিল্পীরা ভারতের অতিথি হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের নাচের একটি দৃশ্য।

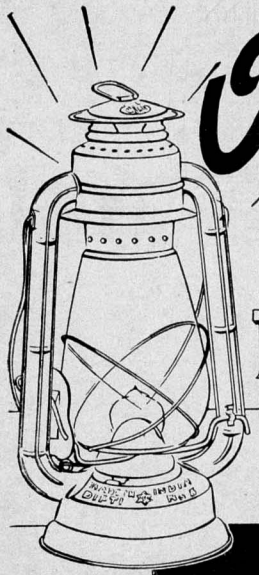

৩টি কারণে

আজ
বেশির ভাগ
লোক কিনছেন

দীপ্তি

কেরোসিন
খরচ কমায়

কখনও
খারাপ হয় না

গভর্ণমেণ্ট প্রশংসাপত্রানুযায়ী প্রতিটী দীপ্তি লণ্ঠন আপনাকে ৬টি বৃটিশ মোম বাতীর সমান আলো দেবে এবং এ আলে ধূম বর্জ্জিত হবে।

গঠনে শক্ত ও
মজবুত
দামে সস্তা

আপনি যখনই কোন লণ্ঠন কিনবেন "দীপ্তি" কিনতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন যে "দীপ্তি" লণ্ঠন কিনলে এর কলকব্জা বিগড়োবার ভয় থাকে না। তাছাড়া নূতন "বারণার" আবিষ্কারের ফলে এর কেরোসিন খরচা ২০ ভাগ কমে গেছে। এর গঠন শুধু মজবুত নয় দেখতেও ভারি সুন্দর। জল ঝড় আর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সবরকম ঋতুতেও এর রং সুন্দর থাকে কারণ খুব ভাল আর দামী রং ব্যবহার করা হয়।

দীপ্তি লণ্ঠন
লক্ষ লক্ষ গৃহ
আলোকিত করে

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ

হেড্ অফিস্ঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফ্যাক্টরীঃ আগড়পাড়া এষ্টেট

Progressive O.M.I. Bengal

সমবায় ভিত্তিক একটি প্রচেষ্টা

সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন ক'রে এবং উৎপাদিত সামগ্রী সমবায়ের ভিত্তিতেই বিক্রীর ব্যবস্থা ক'রে হস্তচালিত তাঁত-শিল্পকে সংগঠিত করা হয়েছে। এর ফলে এই শিল্প ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। ১৯৫২ সালে ৬·৮২ লক্ষ তাঁত সমবায়ের ভিত্তিতে চালানো হোত, বর্ত্তমানে এগুলির সংখ্যা ১২ লক্ষ। হাতের তাঁতে তৈরী বস্ত্রসামগ্রী বিক্রী করা সম্পর্কে বর্ত্তমানে, অন্যান্য ব্যবস্থা ছাড়াও ১৫৯৫টি বিক্রয়কেন্দ্র, ২৯টি আন্তঃরাজ্যিক কেন্দ্র এবং ৩৭টি চলমান বিপণি আছে।

হস্তচালিত তাঁত

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার একটি অচ্ছেদ্য অংশ

অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড
পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০০৪, বোম্বাই-১

DA 59/408

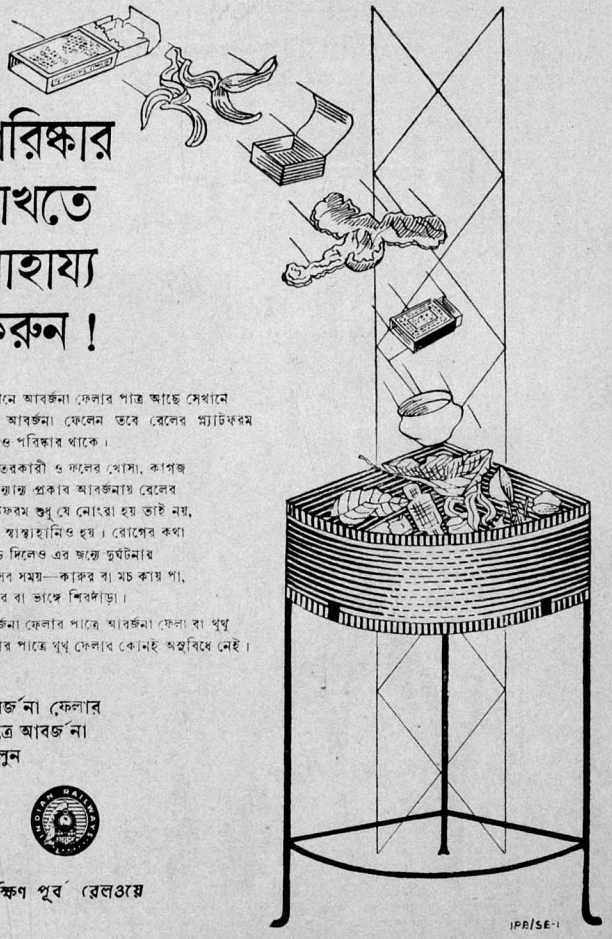

পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করুন !

যেখানে আবর্জনা ফেলার পাত্র আছে সেখানে যদি আবর্জনা ফেলেন তবে রেলের প্ল্যাটফরম আরও পরিষ্কার থাকে।

তরিতরকারী ও ফলের খোসা, কাগজ ও অন্যান্য প্রকার আবর্জনায় রেলের প্ল্যাটফরম শুধু যে নোংরা হয় তাই নয়, এতে স্বাস্থ্যহানিও হয়। রোগের কথা ছেড়ে দিলেও এর জন্যে দুর্ঘটনার ভয় সব সময়—কারুর বা মচ কায় পা, কারুর বা ভাঙ্গে শিরদাঁড়া।

আবর্জনা ফেলার পাত্রে আবর্জনা ফেলা বা থুথু ফেলার পাত্রে থুথু ফেলার কোনই অসুবিধে নেই।

আবর্জনা ফেলার
পাত্রে আবর্জনা
ফেলুন

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

IPR/SE-1

প্রকাশক ও মুদ্রক : সুভো ঠাকুর। এগারো, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কোলকাতা—তেরো। মুদ্রণ : লালচাঁদ রায় এণ্ড কোং। সাত-এর এক, গ্রান্ট লেন, কোলকাতা—বারো।

BENGAL HANDICRAFTS

The Tradition that lives

Issued by the Govt. of West Bengal